ঐতিহাসিক পাঠ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯১

যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের নাম।

Dr. Rajendralala Mitra's Indo-Aryans.
Vicissitudes of Aryan Civilization in India.
McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.
Dr. Hunter's Indian Empire.
India, past and present.
Elphinstone's, Wheeler's and Sewell's History of India.
Maxmüller's Selected Essays, Vol. II.
Maxmüller's Origin and Growth of Religion.
Orme's Historial Fragments of the Mogul Empire.
Tod's Rajsthan.
Cunningham's History of the Sikhs.
Religious Sects of the Hindus.
Ancient Geography of India.
Muir's Sanskrit Texts.
ঋগ্‌বেদসংহিতা।
মনুসংহিতা।
রামায়ণ ও মহাভারত।
প্রবন্ধ-পুস্তক।
হিন্দু মহিলাগণের পূর্ব্বাবস্থা ও ভারত-মহিলা।
হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতি।
বিবিধার্থ-সংগ্রহ।
বঙ্গদর্শন ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক পাঠ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ বা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যাধিকারের ইতিহাস নহে। ইহা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সাময়িক অবস্থার ইতিহাস। প্রাচীন সময় হইতে মুসলমানদিগের আগমন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ এই ইতিহাসে সংক্ষেপে অথচ শৃঙ্খলার নিয়ম অনুসারে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর্য্যদের আদিম অবস্থা কিরূপ ছিল, কি, রূপ অবস্থায় তাঁহারা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন, কিরূপে জ্ঞানী ও সুসভ্য বলিয়া জগতের বরণীয় হন, এবং শেষে কিরূপে বিদেশী মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন, উপস্থিত গ্রন্থে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আমি রামরাবণ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অপেক্ষা আর্য্য-সমাজে অনার্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তি, এবং তিমুর লঙ্গ্ বা নাদির শাহের আক্রমণ অপেক্ষা হিন্দুদের পরাধীনতার কারণ বিস্তৃত রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

রাজ্য-লুব্ধ ব্যক্তির দিগ্বিজয়ের বিবরণ বা নর-শোণিত-প্রিয় ব্যক্তির যুদ্ধ-জয়ের কথা প্রকৃত ইতিহাস নহে। দেশের সভ্যতা ও রীতিনীতি এবং লোকের অবস্থার বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস। যে গ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে, তাহাই পড়িলে প্রকৃত ইতিহাস পাঠের ফল লাভ হয়। ঐতিহাসিক পাঠের অধ্যাপনা হইলে এই ফল লাভ হইবে কি না, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র হইতে এই পুস্তকের উপকরণ

সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের নাম স্থানান্তরে লিখিত হইল। আমি এই সকল গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাময়িক পত্র-লেখকের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। অধিকন্তু এ স্থলে স্বীকার করিতেছি যে, উপস্থিত গ্রন্থের প্রাচীন আর্য্যজাতি-শীর্ষক প্রবন্ধ কলিকাতার সিটি কলেজ-গৃহে পঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা।
৮ই শ্রাবণ, ১২৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণে ঐতিহাসিক পাঠের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত ও কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

২৫ পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তিতে "১০০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত" স্থলে "২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত" হইবে।

৬৯ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে "খ্রীঃ পূঃ ১০০০" স্থলে "খ্রীঃ পূঃ ২০০০" হইবে।

সূচী।

প্রথম পাঠ।

প্রাচীন আর্য্যজাতি।

দ্বিতীয় পাঠ।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের বসতি ও সভ্যতা-বিস্তার।

তৃতীয় পাঠ।

হিন্দু আর্য্যদিগের উন্নতি ও আধিপত্য।

চতুর্থ পাঠ।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম।

পঞ্চম পাঠ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

ঐতিহাসিক পাঠ।

প্রথম পাঠ।

প্রাচীন আর্য্য জাতি।

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি—আর্য্যদিগের আদি-নিবাস-ভূমি—প্রথম অবস্থা—দ্বিতীয় অবস্থা—তৃতীয় অবস্থা—চতুর্থ অবস্থা—জাতি-বিভাগ—আচার ব্যবহার—শিল্পকার্য্য—খাদ্য সামগ্রী—ছন্দোবদ্ধ রচনা—ধর্ম্ম-প্রণালী—ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন—কৃষিজীবী ও পশুপালকদিগের একত্র অবস্থান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে অনৈক্য—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত উভয় সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন।

আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি।

যাঁহারা এক্ষণে হিন্দু, গ্রীক, রোমক, ইতালীয়, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই মূল জাতি "আর্য্য" নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মান্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আর্য্য বলা যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কৃষক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে "ঋ" ধাতু হইতে "আর্য্য" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ঋ ধাতুর অর্থ চাস করা। আর্য্যদিগের আদিম অবস্থা যখন কিছু উন্নত হয়, যখন তাঁহারা কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ

করেন, তখন বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে "আর্য্য" সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মূল আর্য্য জাতি প্রথমে এশিয়া খণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। চঙ্গেজ্ খাঁ, তিমুর লঙ্গ প্রভৃতি দিগ্বিজয়-মত্ত ভূপাতিগণ যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, এক সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে ঘোরতর আতঙ্ক বিস্তার ও নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া ছিলেন, আদিম আর্য্যগণ প্রথমে সেই স্থানেরই একাংশে বাস করিতেন। গ্রীক, রোমক ও পারসীকেরা কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বদিকে তাঁহাদের দেব-ভূমি রহিয়াছে। আবার হিন্দুগণ যখন পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন, তখন তাঁহারা কহিতেন যে, তাঁহাদের স্বর্গ উত্তর দিকে আছে। এখন এই সকল জাতির পবিত্র স্থানের সন্নিবেশের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড ইহাঁদের আদি নিবাস-স্থান। মানচিত্র-সমূহে এই ভূখণ্ড স্বাধীন তাতার নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সমুন্নত মালভূমিতে পরিব্যাপ্ত। আমূদরীয়া ও মুরঘাব নদী ইহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তরে কিজলকম্ প্রভৃতি বালুকাময় মরুভূমি, পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে হিন্দুকুশ এবং পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর। বর্ত্তমান সময়ে বল্খ, সমরকন্দ, মিসেদ ও হিরাত ইহার প্রধান নগর। প্রাচীন সময়ে শিথিয়া (শক জাতির আবাস-ভূমি), পারথিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। যাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে পৃথিবীতে সুসভ্য জাতি বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন, এই প্রদেশের একাংশ তাঁহাদের আবাস-ভূমি ছিল।

আদি-নিবাস-ভূমি।

বর্ণিত ভূখণ্ড আয়তনে অনেক বড়। এই আয়ত প্রদেশের কোন্ অংশে আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন, সূক্ষ্মরূপে তাহার নির্দ্দেশ করা একরূপ দুঃসাধ্য। যাহা হউক, পণ্ডিতগণের গবেষণায় এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, হিরাত হইতে বল্থ পর্য্যন্ত রেখার দক্ষিণে এবং বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন।

প্রথম অবস্থা।

ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার বহু পূর্ব্বে এই আদিম আর্য্যগণ আপনাদের প্রথম অবস্থায় তাদৃশ সভ্য ছিলেন না। তাঁহারা মৃগয়া-লব্ধ বন্য পশুর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিতেন এবং সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে পশু-হননে বহির্গত হইতেন। তাঁহারা সোম-রস-প্রিয় ছিলেন। এই মদিরা সেবনে তাঁহাদের মৃগয়া-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত। গৃহ নির্ম্মাণে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। বন্য জন্তুর সমাগম নাই, বা কণ্টক-ময় ঝোপ নাই, এমন পরিষ্কৃত ক্ষেত্রে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। অগণ্য-তারকা-শোভিত বিশাল আকাশ বা সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহাদের মানসিক ভাব বিস্তৃত করিত না, লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র বা অরুণ-রঞ্জিত উষা তাঁহাদের হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চারে সমর্থ হইত না, এবং সমুন্নত পর্ব্বত বা বেগ-বতী তরঙ্গিণী তাঁহাদিগকে জ্ঞানের উচ্চতর মন্দিরে তুলিয়া দিত না। তাঁহাদের চারি দিকে প্রকৃতির এই সকল ভীষণ ও কমনীয় কান্তি বিরাজ করিত, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হইত না। কে তাঁহাদের সম্মুখে এই সকল দৃশ্য প্রসারিত রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাঁহারা জীবিত

থাকিয়া প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে বাস করিতেছেন, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিতেন না। বন্য জন্তুর উপদ্রব নিবারণ ও জীবন ধারণার্থ পশু-হননই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় ছিল। তাঁহারা বন্যভাবে আপনাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের বনে বনে বেড়াইতেন, এবং উচ্চতর জ্ঞান ও ধর্ম্মে বঞ্চিত থাকিয়া এই বন্য ভাবেই আপনাদের জীবিত কাল অতিবাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় অবস্থা।

ক্রমে তাঁহাদের এই বন্য-ভাব তিরোহিত হইল। ক্রমে তাঁহারা আরণ্য পশুদিগকে বশ করিতে শিখিলেন, ক্রমে সেই বশীভূত পশুদিগের প্রতিপালনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল। এই সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হইতে লাগিল। ভূমি-কর্ষণে গবাদি জন্তু বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা যথানিয়মে এই সকল জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের মমতা ও সমবেদনা জন্মিল। পূর্ব্বতন আরণ্য প্রকৃতি তিরোহিত হইল, এবং কোমলতা, মৃদুতা ও সৌম্যভাব তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক আপনাদের গবাদি পশু পালন করিতে লাগিলেন। গৃহপালিত গাভীর নিরীহ ও শান্তভাব দর্শনে তাঁহাদের প্রকৃতি অধিকতর নিরীহ ও শান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এখন একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন, সাধারণের প্রতি সৌহার্দ্দ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিবার-বদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। গবাদি জীবের চারণ-ভূমি তাঁহাদের রাজ্য, গৃহ-পালিত পশু তাঁহাদের সম্পত্তি, এই সকল জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাদের কার্য্য,

ইঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন তাঁহাদের আমোদ, এবং ইহাদের দুগ্ধ তাঁহাদের প্রধান পানীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে গবাদি জীবের জন্য অধিক চারণ-ভুমির প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহারা যত্ন সহকারে বর্ষা প্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ হইল। তাঁহারা ধীর ভাবে আকাশ ও পৃথিবী, উভয়েরই বিভিন্ন পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন, এবং চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা আপনাদের সময় নিরূপণ করিতে অভ্যাস করিলেন। এই পশু-পালক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন আপন দলের অধিনায়ক হইলেন। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে অধিনায়কের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ও প্রাধান্য অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় অবস্থা।

ক্রমে কৃষি-কার্য্য আরম্ভ হইল। আর্য্যগণ বলদ প্রভৃতির সাহায্যে হল-চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে গাভীগণ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে লাগিল। কৃষিজীবীগণ এই দুগ্ধ ও গোধূম-চূর্ণ দিয়া উৎকৃষ্টতর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কৃষি-ক্ষেত্র ইঁহাদের স্থায়ী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। এই আদিম সময়ে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, সুতরাং ক্ষেত্র হইতে যাহা লাভ হইত, তদ্দ্বারা আর্য্যগণের ভরণ পোষণ অক্লেশে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কৃষি-ক্ষেত্রের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইত, উৎপন্ন শস্য-সম্পত্তিতে যখন আবাস-গৃহ পরিপূর্ণ হইত, তখন আর্য্যগণ আপনাদের প্রয়োজন মত সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে কৃষিজীবী আর্য্য সম্প্রদায়, গবাদি

পশু ও আপনাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া সংসার-ধর্ম্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত হন।

চতুর্থ অবস্থা।

আত্ম-প্রাধান্য রক্ষার জন্য আর্য্যগণ ক্রমে সাহসী ও রণ-পটু হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যে এক এক জন রাজার অধীনে সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজারা আপনাদের শাসনাধীন জনপদের উৎকর্ষের জন্য আইন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের রণ-দক্ষতা প্রকাশের জন্য চারণগণ নিযুক্ত হইল। এই সকল চারণ যুদ্ধ-বিষয়িনী গীতিকা মধুর স্বরে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। যুবকেরা এই গানে উত্তেজিত হইয়া আত্ম-প্রাধান্য দেখাইতে অগ্রসর হইল। যাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও বলবান্ ছিল, তাহারা শত্রু-পক্ষের উপর আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংগঠিত হইল। প্রতি ক্ষুদ্র রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকে পরিপূর্ণ হইরা উঠিল। ইহারা রাজাকে যথানিয়মে কর দিত। সামান্য রূপ বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা সভ্যতার এই শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

জাতি-বিভাগ।

উপরে যে চারি অবস্থা বর্ণিত হইল, তাহাতে আদিম আর্য্যদিগের জাতি-বিভাগের বিষয় জানা যাইবে। সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া উঠেন। পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক হইল, আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশে

বাস করিতেন। এই সময়ে তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী যে অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা সহজে বোধ হইবে। তাঁহারা প্রধানতঃ তিন জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক সম্প্রদায় মৃগয়া দ্বারা, অপর সম্প্রদায় পশুপালন দ্বারা এবং তৃতীয় সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃগয়াজীবী আর্য্যেরা রূঢ় ও উদ্ধত-প্রকৃতি, পশুপালকেরা অলস, অধ্যবসায়-রহিত এবং কৃষিজীবীরা পরিশ্রমী ও নিয়মিত রূপে কার্য্যকারী ছিলেন। প্রথম দুই সম্প্রদায়ের আর্য্যেরা আপনাদের ব্যবসায়ের অনুরোধে এক স্থানে বাস করিতেন না। যেখানে মৃগয়ার উপযোগী জীব জন্তু পাওয়া যাইত, মৃগয়াজীবীরা সেইখানে গিয়া বাস করিতেন। মৃগয়া জীবের অভাব হইলে আর সেখানে থাকিতেন না, স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। এইরূপে পশুপালকেরা, যেখানে ভাল তৃণ-ক্ষেত্র পাওয়া যাইত, সেইখানে অবস্থান করিতেন। অধ্যুষিত স্থানে তৃণাদির অভাব হইলে আবার ভাল চারণ-ভূমি পাইবাব আশায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাসস্থানের স্থিরতা না থাকাতে মৃগয়াজীবী ও পশুপালকেরা কোন স্থানেই স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন না। তাম্বুর ন্যায় গৃহ-বিশেষই তাঁহাদের অবস্থার উপযোগী ছিল। কিন্তু কৃষিজীবীরা এরূপ নানাজনপদ-বিহারী ছিলেন না। তাঁহাদিগকে এক স্থানে থাকিয়া কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে হইত। এজন্য তাঁহারা দৃঢ় ও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানও অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। তাঁহারা পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইলে সরল ও পবিত্র গোষ্ঠী-কথায়

তাঁহাদের অবকাশ-সময় অতিবাহিত হইত। এই কৃষিজীবী আর্য্যগণ হইতে প্রথমে দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হয়।

এই প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে বিবাহের রীতি ছিল। বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। একের অধিক দার পরিগৃহীত হইত। সকলে পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। উত্তরাধিকারের নিয়ম ও সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। দণ্ডবিধি অনুসারে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ-কার্য্য নিবারণ করা হইত। সকলেই শান্ত ও সংযত-চিত্ত হইয়া প্রচলিত বিধি সকল মানিত। পিতা পরিবার পালন করিতেন, মাতা আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণ ও ব্যবস্থা করিতেন, এবং দুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেন। এইরূপে পরিবার-রক্ষার ভার পিতার (কর্ত্তার) প্রতি, সংসারিক কার্য্যের ভার মাতার (কর্ত্রীর) প্রতি, এবং আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহের ভার দুহিতা প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত ছিল। পরিবার মধ্যে যিনি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, তিনি ভক্তিভাবে আরাধ্য দেবতার নিকট আপনাদের কুশল প্রার্থনা করিতেন।

আচার ব্যবহার।

এই সময়ে শিল্প কার্য্যের তাদৃশ উন্নতি না হইলেও আর্য্যেরা আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তাঁহারা পশু-বিশেষের চর্ম্ম বা লোম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে গৃহ-কর্ম্মের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার ছিল। স্বর্ণ, স্বর্ণময় আভরণ, তাম্র ও লৌহ তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা অবস্থা-বিশেষে ও বিষয়-বিশেষে এই সকল ধাতুর ব্যবহার করিতেন। সম্প্রদায়ের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহা-

শিল্প-কার্য্য।

দের মধ্যে বস্ত্রের পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা শীত-প্রধান দেশ-বাসী ছিলেন, এজন্য তিন সম্প্রদায়ই শীত নিবারণের উপযোগী চর্ম্ম বা লোম-নির্ম্মিত কাপড় ব্যবহার করিতেন।

খাদ্য সামগ্রী।

আর্য্যদিগের খাদ্য সামগ্রী একরকম ছিল না। তিন সম্প্রদায়ই আপনাদের অবস্থা ও ব্যবসায়ের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আহার করিতেন। মাংস মৃগয়াজীবীদের খাদ্য ছিল। কিন্তু পশুপালক ও কৃষি-জীবীরা কেবল মাংসের উপর নির্ভর করিতেন না। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ও গবাদি জীবের দুগ্ধও তাঁহাদের জীবন রক্ষার অবলম্ব ছিল। মৃগয়াজীবী ও পশুপালকেরা সুরাপায়ী ছিলেন। সোম মদিরা ইহাঁদের বড় প্রিয় ছিল। এতদ্ভিন্ন ইঁহারা গম, যব হইতে এক্ষণকার পচাইয়ের মত এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিতেন। কৃষিজীবীরা এরূপ সুরাসেবী ছিলেন না। ইঁহারা অল্প পরিমাণে সোমরস পান করিতেন। বস্তুতঃ কৃষিজীবীগণ অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। আহার পানে ইহাঁরা মত্ত হইতেন না। এজন্য ইঁহাদের প্রকৃতি অতিশয় নিরীহ ছিল। সকল দেশেই কৃষকদিগের এই নিরীহ ভাব দেখা যায়।

ছন্দোবদ্ধ রচনা।

আর্য্যগণ প্রথম অবস্থায় ছন্দোবদ্ধ রচনার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে এই সকল ছন্দোময়ী কবিতার আবৃত্তি হইত। কবিতার স্বর ও ছন্দের পবিত্রতা সাধনে আর্য্যেরা বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। অপরিশুদ্ধ ছন্দে কোন কবিতা প্রণীত হইলে বা অপরিশুদ্ধ স্বরে কোন কবিতা পাঠ করিলে তাঁহারা আপনা-দিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন। ঋগ্‌বেদে

আদিম আর্য্যদিগের এই সকল ছন্দোময়ী রচনা দেখা যায়। এগুলি তাঁহাদের তদানীন্তন পরিশুদ্ধ রুচি ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রধান পরিচয়। এই সকল রচনা লিখিত হইত না। আদিম আর্য্যেরা লিখিতে জানিতেন না। এগুলি বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিত।

ধর্ম্ম-প্রণালী।

আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী তাঁহাদের সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান বিষয়। মানুষ যখন সাতিশয় অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন দেবতার সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা থাকে না। সে যখন এই অবস্থা হইতে কিছু উন্নত হয়, তখন দেবতাকে আপনার শত্রু, সুতরাং ভয়ের বিষয় বলিয়া মনে করে। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সে প্রথমে আপনার এই ভয়-জনক শত্রুকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। নিকোবর দ্বীপের অসভ্যেরা আপনাদের দেবতাকে সর্ব্বদা ভয় দেখাইতে চেষ্টা পায়। প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে আফ্রিকার নিগ্রোরা আপনাদের দেবতাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার পর মানুষের গৌরব ও সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেবতারাও গৌরব-পূর্ণ ও সুসভ্য হইতে থাকেন। কিন্তু ইহাঁদের ক্ষমতা প্রসারিত হয় না। উহা এক একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। এক জন সমুদ্রের অধিপতি হন, একজন ভূমির উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করেন, একজন মেঘের নিয়ামক হন, অন্য জন পর্ব্বতের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। অধিকতর ক্ষমতাশালী দেবতারা প্রায়ই নির্দ্দয় ও হিংসা-পর হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে শোণিত মাংস দিয়া পরিতর্পণ করিতে হয়। আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতেরও এইরূপ

পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। আধুনিক অসভ্যদিগের ন্যায় প্রথমে ইহাঁদেরও দেবতার সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। পরে ইহাঁরা আপনাদের অনিষ্টকারী ও হিংসাপর দেবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। শেষে ইহাঁদের মধ্যে বহুসংখ্য দেবতার সৃষ্টি হয়। এক একটি দেবতা অনন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতি-রাজ্যের এক একটি বিষয়ের অধিপতি হইয়া উঠেন। এইরূপে ইন্দ্র, মরুৎ, দ্যৌস্ (স্বর্গ), পৃথ্বী, উষা, অগ্নি, পর্জ্জন্য, বায়ু, অদিতি প্রভৃতি দেবতার কল্পনা হয়। এই সকল দেবতার সৃষ্টি এক দিনে বা এক সময়ে হয় নাই। প্রাচীন আর্য্যদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন দেবতার সৃষ্টি ও পূর্ব্বতন দেবতার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ইন্দ্র পৌরাণিক ধর্ম্ম-জগতে দেবরাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন, মৃগয়াজীবী আর্য্যদিগের মধ্যে সেই ইন্দ্র একটি কাল্পনিক বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই বৃত্তি পশু-হনন সময়ে মৃগয়াজীবীদিগকে বল, উৎসাহ ও তেজ দিত। সোমরস-পানে ইহা প্রদীপ্ত হইত। ইহা মৃগয়া-জীবীদিগকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া তাহাদিগকে বিজন গিরি-গহ্বরে বা অগম্য বনান্তরে লুক্কায়িত শ্বাপদদিগের নিধনে নিয়োজিত রাখিত। এই গিরিগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য সমূহকে বৃত্র বলা যাইত। এক দিকে ইন্দ্র মৃগয়াজীবী আর্য্যদিগকে পশু হননে প্রবর্ত্তিত করিত, অপর দিকে বৃত্র এই পশুদিগকে আপনার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিত। সুতরাং ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের চিরন্তন শত্রুতা ছিল। চিরদিন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইত। ইহার পর আর্য্য সম্প্রদায় যখন সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করেন, যখন তাঁহারা পশুপালনে ও পশুদিগের চারণ-ভূমির উৎকর্ষ

বিধানে মনোযোগী হন, তখন তাঁহাদের ইন্দ্র ও বৃত্রেরও অবস্থা-ন্তর প্রাপ্তি হয়। আর্য্যেরা দেখিলেন, বৃষ্টিপাতে ক্ষেত্র সমুদয় নব-দূর্ব্বাদলে শোভিত হইয়া উঠে, তরুলতা সকল পল্লবিত হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করে। এই সময়ে তাহাদের কোন ভাবনা থাকে না, তাহাদের অদ্বিতীয় সম্পত্তি—গৃহপালিত গবাদি পশু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে থাকে; পর্য্যাপ্ত আহার পানে ইহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, এবং যথাসময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া আপনাদের প্রতিপালকদিগকে সন্তুপ্ত করিতে থাকে। বৃষ্টির এইরূপ উপকারিতা দেখিয়া আর্য্যেরা ইন্দ্রকে বজ্রধারী ও বৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, ইন্দ্র সদয় হইলে বৃষ্টি দ্বারা জনপদ জল-সিক্ত হয় এবং তৎপ্রযুক্ত চারণ-ভূমি নানাপ্রকার তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সভ্যতার আদিম অবস্থায় এরূপ বিশ্বাস অসম্ভব নহে। সিন্ধুদেশের নিম্ন শ্রেণীর কৃষক-সম্প্রদায়ের আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে যে, তাহাদের সিন্ধু নদের ন্যায় আকাশে বড় বড় নদী সকল রহি-য়াছে। এই সকল নদীর তট দেশ যখন প্লাবিত হয়, তখনই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বৃষ্টিতে তাহাদের কৃষি-ক্ষেত্র সকল শস্যশালী হয়। আদিম আর্য্যেরা এইরূপ সংস্কারের বহির্ভূত ছিলেন না। এইরূপ সংস্কার প্রযুক্তই বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রের কল্পনা হয়। কিন্তু ইন্দ্র আপনার এই অবস্থাতেও প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য ছিলেন না। যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেত্র সকল বিশুষ্ক হইয়া যাইত, নবীন তৃণদলের অভাবে গবাদি পশু বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, পশুপালক আর্য্যেরা আপনাদের পশু-

যথের দুর্দ্দশা দেখিয়া ম্রিয়মাণ ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঠিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে তাঁহাদের দুর্গতির অবধি থাকিত না। আকাশে নবীন মেঘের উদয় হইলে তাঁহারা উৎফুল্ল নেত্রে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতেন, কিন্তু এই আশাপ্রদ মেঘ যদি উড়িয়া যাইত, গগন-মণ্ডল যদি আবার পরিষ্কার হইত, তাহা হইলে তাঁহারা বিষন্ন হইয়া ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অনাবৃষ্টিকারী বৃত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। এইরূপে নিবিড় অরণ্য ও গিরি-গহ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃত্র ক্রমে অনাবৃষ্টির কর্ত্তা হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে বৃত্র শ্বাপদ-কুলকে লুক্কায়িত রাখিয়া ইন্দ্রের ব্যাঘাত জন্মাইত, এখন সেই বৃত্র অনন্ত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া, বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রের ব্যাঘাত জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। আর্য্যেরা আপনাদের গৃহপালিত জীব-সমূহের মঙ্গল কামনায় সংযতচিত্তে ভক্তি-রসার্দ্র হৃদয়ে ইন্দ্রের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন; বৃষ্টি না হইলে বৃত্রের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আবার সেই ইন্দ্রে-রই শরণাপন্ন হইতেন। আর্য্যদিগের ইতিহাসে সভ্যতার উৎ-কর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের উৎকর্ষের এই সূত্রপাত।

দ্যৌঃ, পৃথ্বী, উষা, অদিতি, অগ্নি প্রভৃতি এক একটি পৃথক্ দেবতা। আর্য্যেরা দ্যৌঃকে পিতা এবং পৃথ্বীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলে দৌষ্পিতৃ অর্থাৎ (পিতা দ্যৌঃ) শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্যৌঃ বৃষ্টিধারী ইন্দ্রের জনক। উষা-সমাগমে আর্য্যগণ শয্যা হইতে উঠিয়া আপনা-দের রক্ষণীয় পশুদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। এই সময়ে তাঁহাদিগকে দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। তাঁহারা শুচি হইয়া এই সময়ে হল স্কন্ধে করিয়া, স্নেহ-

পালিত গোধন সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্রে যাইতেন। সুতরাং উষা কৃষিজীবী আর্য্যদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের নিয়ন্ত্রী ছিল। আর্য্যেরা আপনাদের কার্য্যের কুশল কামনায় ভক্তিভাবে এই উষার আরাধনা করিতেন। উষার ন্যায় অদিতির দেবীভাবও প্রাচীন আর্য্যদিগের কল্পনা-সম্ভূত। আর্য্যদিগের আদিম অবস্থায় বন্য পশুদিগের আশ্রয়স্থল গিরি-সঙ্কট, গিরি-গহ্বর প্রভৃতি বিভক্ত ও উচ্চ নীচ স্থান "দিতি" নামে অভিহিত হইত। দিতি-শূন্য অর্থাৎ তৃণ-সমাচ্ছাদিত প্রশস্ত সমভূমি-খণ্ডের নাম "অদিতি" ছিল। দিতি যেমন ভয় ও আতঙ্কের উদ্দীপক ছিল, অদিতি তেমন ছিল না। আর্য্যেরা অদিতির ভক্ত ছিলেন, যেহেতু ইহা তাঁহাদিগকে বন্য পশুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত, এবং তাহাদের পরম স্নেহের ধন গবাদি জীবের আশ্রয়-ভূমি ছিল। সুপ্রশস্ত শ্যামল ক্ষেত্রের এক দেশ দিয়া পার্ব্বত্য সরিৎ বহিয়া যাইতেছে, অদূরে গৃহ-পালিত পশুপাল নবীন তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেছে, স্থানে স্থানে শস্যাদির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী সুচ্ছায় তরুতলে বসিয়া কৃষি-জীবী আর্য্য-সম্প্রদায় যখন এই সকল দেখিতেন, তখন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তি সহজেই বলবতী হইত। নবীন অবস্থায় নবীন কল্পনায় মত্ত হইয়া তাঁহারা তখন সমস্বরে অদিতির স্তুতি-গীতি গাই-তেন। অদিতি ক্রমে অনন্ত, অসীম বলিয়া পরিগণিত হয়। অনন্ত আকাশের যে অংশ হইতে প্রতিদিন জগজ্জীবন জগৎপ্রভাকর প্রভা বিকাশ করিতেন, সেই অংশ অদিতি নামে উক্ত হইত। সর্ব্বশেষে অদিতি দেব-জননী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অদিতির ন্যায় অগ্নির উপরেও আর্য্যদিগের অটল ভক্তি ও শ্রদ্ধা

ছিল। এই আদিম অবস্থায় সকলের গৃহেই গার্হপত্য অগ্নি থাকিত। পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি প্রাতঃকালে সংযতচিত্ত হইয়া, ফল মূল প্রভৃতি উপহার দিয়া এই অগ্নির উপাসনা করিতেন।

প্রাচীন আর্য্য জাতির এই ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণে প্রতিপন্ন হইবে যে, তখন পৌত্তলিকতা ছিল না। কেহ কোনরূপ দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিতেন না। কোনরূপ দেব-মন্দির বা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইত না। কেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাহারও পুরোহিত ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় সংগঠিত হইত না। প্রকৃতি-রাজ্যে যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ, যাহা দেখিলে হৃদয়ে গভীর ভাবের আবির্ভাব হয়, আর্য্যগণ একান্ত মনে তাহারই উপাসনা করিতেন। সে সময়ে আর্য্য-জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জ্জিত হয় নাই, আর্য্যগণ সে সময়ে এই সুকৌশল-সম্পন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই, এই অবস্থায় তাঁহারা যাহার উপ-কারিতা বা মহত্ত্ব দেখিতেন, তাহারই দেবত্ব স্বীকার করিয়া তদ্গতচিত্তে তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। প্রতি পরিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডই পবিত্র দেব-মন্দির স্বরূপ ছিল, প্রতি গৃহ-স্বামীই শান্তিপরায়ণ পুরোহিত হইয়া সাধারণের কুশল প্রার্থনা করিতেন, প্রতি পরিবারই উপাসনা-সময়ে আপনাদের বরণীয় দেবতার মহীয়সী শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট হইত। উপাসনার প্রণালী সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর-শূন্য ছিল। কোন রূপ পার্থিব বিকার দ্বারা ইহা কলুষিত করা হইত না। সরলভাবে সরল-হৃদয়ে সকলেই এই সরল আরাধনা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

আর্য্যদিগের তিন সম্প্রদায় এক ভাবে আপনাদের বরণীয় দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিতেন না। মৃগয়াজীবীদের দেবতা পশু-হননে সাহায্যকারী ছিলেন, পশু-পালকদিগের দেবতা পশু-যূথের মঙ্গল বিধান করিতেন, এবং কৃষি-জীবীদিগের দেবতা কৃষি-ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনে ও কৃষি-বস্তুর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতেন। পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রার্থনার এইরূপ পার্থক্য থাকি-লেও সকলেই এক ভাবে আপনাদের দেবতার মহত্ত্ব স্বীকার করিতেন। সকলের দেবতাই পরিপূর্ণ, মঙ্গলময় ও হিংসা-লোভাদি-শূন্য ছিলেন। এই মঙ্গলময় দেবতা হইতে কোন অমঙ্গল হইবে বলিয়া, কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন, এরূপ মঙ্গল-বিধাতা দেবগণ থাকাতেও অনাবৃষ্টি, রোগ, মহামারী প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গলের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহারা এই সকল অমঙ্গলের কর্ত্তা কতক-গুলি দুষ্ট যোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেন। তাঁহারা ভাবি-লেন, এই সকল দুষ্ট যোনি সর্ব্বদা মঙ্গলময় দেবগণের সহিত যুদ্ধ করে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া নানা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন।

এই আদিম আর্য্য-সম্প্রদায় কত কাল পর্য্যন্ত আপনাদের আদি নিবাস-ভূমিতে একত্র ছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এখন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তাঁহাদের দল যখন ক্রমে বাড়িয়া উঠে, কৃষি-ক্ষেত্র সকল যখন ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের পার্থক্য যখন প্রবল হইতে থাকে, তখন বোধ

হয়, তাঁহারা মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মৃগয়াজীবী ও পশুপালক আর্য্যগণ এক স্থানে বাস করিতেন না। যেখানে বন্য পশু এবং ভাল চারণ-ভূমি পাওয়া যাইত, তাঁহারা সেইখানে যাইয়া অবস্থিতি করিতেন। সম্ভবতঃ এই মৃগয়াজীবিগণ প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব দিকে তুরেণীয় নামক অসভ্য জাতি বিশেষ প্রবল ছিল। তাহাদের আবাস-ভূমিতে তাহারাই একাধিপত্য করিত। সুতরাং আর্য্যগণ পূর্ব্ব দিকে যাইতে পারিলেন না। উত্তর,পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক তাঁহাদের নির্গমন-দ্বার হইল। তাঁহারা এই তিন দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই উপনিবেশ-স্থাপন এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এক সময়ে সকল সম্প্রদায় একত্র হইয়া এক দিকে গমন করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ-স্থাপনের কার্য্য চলিয়াছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যগণ বহুদেশে আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ প্রথমে কোন্ দিকে অগ্রসর হন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এস্থলে প্রথমে উত্তর দিক তাঁহাদের গমনপথ বলিয়া ধরা যাইতেছে। মধ্য এশিয়ার মাল-ভূমি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া পশ্চিমে গেলে ইউরোপে উপনীত হওয়া যায়। এই ইউরোপে আমরা "স্লাবনীয়," "লিথুনীয়" ও "টিউটন" এই তিনটি জাতি দেখিতে পাই। এই তিন জাতির লোক প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তান। এখন এই জাতি-ত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান-

রুশীয় ও পোলগণ স্লাবনীয় আর্য্য। প্রশীয়গণ লিথুনীয় আর্য্য-জাতির সন্তান, এবং জর্ম্মণ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইঙ্গরেজ প্রভৃতি টিউটন আর্য্য।

ইহার পর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী পথের অনুসরণ করিলে প্রথমে পারস্যে উপনীত হওয়া যায়। পারস্য দেশ একটি প্রধান আর্য্য-উপনিবেশ ছিল। পারস্য হইতে কয়েকটি বিভিন্ন দল পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া 'কেল্‌টিক,' 'আর্ম্মাণী,' 'হেলেনিক' প্রভৃতি জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কেল্‌টিকগণ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইয়া, সিরিয়া ও মিশরদেশ দিয়া আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনীত হয়। সেখান হইতে ইউরোপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। আইরিষ্‌ প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই কেল্‌টিক আর্য্যদিগের সন্তান। এশিয়া হইতে আফ্রিকার উত্তর-সীমান্তভাগ অতিবাহন-সময়ে আর্য্যগণ পশ্চাতে আপনাদের কোন চিহ্ন রাখিয়া যান নাই। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আর্য্য-উপনিবেশের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পথে "সেমিতিক" নামক পরাক্রান্ত জাতি তাঁহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা কোন স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন নাই, এজন্য পথে তাঁহাদের উপ-নিবেশেরও কোন চিহ্ন থাকে নাই।

আর্ম্মাণীগণ অধিক দূরে অগ্রসর হয় নাই। এশিয়াস্থিত তুরুস্কের স্থান-বিশেষই ইহাদের আবাস-ভূমি হইয়া উঠে। হেলে-নিক্‌ জাতি এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীশে ও ইতালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়। এই জাতি হইতে ইউরোপ-খণ্ডে সভ্যতার

আলোক বিস্তৃত হইয়া ছিল। গ্রীক ও রোমকগণ এই হেলেনিক আর্য্যদিগের সন্তান।

কৃষিজীবী ও পশুপালকদিগের একত্র অবস্থান।

মৃগয়াজীবীগণ বহু দলে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দিকে গমন করিলেও আদি আর্য্য-ভূমির জন-সংখ্যা কমিয়া যায় নাই। বরং উহা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এজন্য পশুপালক ও কৃষিজীবিগণ আপনাদের আবাস-স্থানের সীমা বাড়াইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদের দক্ষিণ দিকে গমনের আরও একটি কারণ ছিল। যে তুরেণীয় জাতির পরাক্রমে আর্য্যগণ পূর্ব্ব দিকে যাইতে পারেন নাই, সেই জাতি ক্রমে এশিয়ার অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে পারস্য হইতে মিশর দেশ পর্য্যন্ত ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। এই জাতির উপদ্রবে আর্য্যগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া আফগানিস্তানে উপনিবিষ্ট হন। কতকাল পর্য্যন্ত ইঁহারা এই স্থানে একত্র ছিলেন, প্রাচীন ইতিহাস তাহা বলিয়া দিতে পারে না। তবে এইমাত্র জানা যায়, ইহাঁদের এক দল সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চনদে আসিবার বহু পূর্ব্বে ইহাঁরা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে একত্র বাস করিতেছিলেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে অনৈক্য।

পশু-পালক ও কৃষিজীবী আর্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল না। বিভিন্ন আচার ব্যবহার উভয় সম্প্রদায়কে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। পশুপালকেরা পশুমাংস ও উগ্র সুরা-প্রিয় ছিলেন, কৃষিজীবিগণ প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ও ফল মূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ

করিতেন। প্রথম সম্প্রদায় ভাবিতেন, পশু-বলি ও তেজস্কর সোম-মদিরা দিলে তাঁহাদের দেবগণ সন্তুষ্ট হন, দ্বিতীয় সম্প্রদায় ভাবিতেন, সুস্বাদ ফল মূল ও তীব্র মাদকতা-রহিত সোম লতার রসে তাঁহাদের দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এক দল হিংসাশীল ও পরিবর্ত্তন-প্রিয় ছিলেন, অন্য দল নিরুপদ্রব ও শান্তিময় জীবনের প্রশংসা করিতেন। এই রূপ বিভিন্ন প্রকৃতিতে উভয় দলের অরাধ্য দেবতাও বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া উঠেন। সাহসী, উদ্ধত, কোপন-স্বভাব ও সমর-পটু দেবতা পশু-পালকদিগের অধিকতর যোগ্য হইলেন, এবং নম্র, নিরীহস্বভাব ও শান্তি-প্রিয় দেবতা কৃষি-জীবীদিগের প্রকৃতির সাহত সমঞ্জসীভূত হইয়া উঠিলেন। উভয় সম্প্রদায় আপনাদের দেবতাদিগকে এই রূপ বিভিন্ন প্রকৃতি মনে করাতে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনৈক্য উপস্থিত হইল। "দেবগণ" পশুপালকদিগের পরিচালক হইলেন, "অসুরগণ"* কৃষি-জীবিগণের অধিনেতা হইয়া উঠিলেন।

---

* শব্দবিদ্যার নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় "স" কারের স্থানে আবস্তিক ভাষায় "হ" কারের আদেশ হয়। সুতরাং সংস্কৃত 'অসুর' ও আবস্তিক 'অহুর' অভিন্ন শব্দ। প্রাচীন বেদ-সংহিতার কোন কোন স্থলে অসুর শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাকারক সায়নাচার্য্যের মতে অসুর শব্দের অর্থ প্রাণদাতা। উহা "অস্" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ অনেকবার 'অসুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আবার এই বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীকেও 'অসুর' বলা হইয়াছে। ইন্দ্র 'অসুরঘ্ন' অর্থাৎ অসুর-নিহন্তা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, অসদ্ভাব জন্মিবার পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'অসুর' শব্দ দেব-বাচক ছিল। উত্তর কালে হিন্দু আচার্য্যেরা অসুরদিগকে দেবদ্বেষী

পশু-পালকগণ ইন্দ্রকে দেবগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, কৃষিজীবিগণ অহুরমজ্‌দকে অসুরদিগের আধিপত্য দিলেন। পশুপালকেরা আপনাদের দেবতা—দেবগণকে নানাগুণ-ভূষিত ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, এবং কৃষিজীবীদিগের দেবতা—অসুরদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন, কৃষিজীবীরা আপনাদের দেবতা অহুরদিগকে ধর্ম্মপর ও উৎকৃষ্ট গুণান্বিত বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেবদিগকে 'দেও' অর্থাৎ দৈত্য বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্প্রদায়-বিশেষের এক এক জন কর্ত্তা ছিলেন। কবিগণ বীর রসের উদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে অনেক সময় পাইতেন। উভয় দলের পুরোহিতগণ আপনাদের দেবতাদিগের অসীম শক্তি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। সমাজে এই সকল কবি ও পুরোহিতের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই ইহাঁদিগকে সম্মান করিত এবং সকলেই ইহাঁদের কথায় আস্থা দেখাইত। এখন এই কবিগণ কবিতা গাইয়া আপনাদের দল উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, পুরোহিতেরাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা আপনাদের সম্প্রদায়ের সমক্ষে দেব-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে ইহাঁদের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিল, এবং ইহাঁদের গান ও ইহাঁদের বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া আপন আপন প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা-পূজকদিগের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই মহাসংগ্রামই বোধ হয়, পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বলিয়া বর্ণনা করিয়া আপনাদের দেবতাদিগকে 'সুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই রূপে পশুপালক ও কৃষিজীবীদিগের মধ্যে আত্ম-বিগ্রহ উপস্থিত হইল। এই বিগ্রহ কিছুতেই নিবারিত হইল না। উভয় দলে অনেক বার যুদ্ধ হইল। উভয় দল অনেক বার আপনাদের সমর-চাতুরী দেখাইল। উভয় দলের অধিনেতারা অনেক বার রণ-ক্ষেত্রে আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। জয়শ্রী একবার এক দলকে গৌরবান্বিত করিতে লাগিল, আর একবার আর এক দলের পক্ষ-শোভিনী হইয়া উঠিল। পশু-পালক-দল অবশেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকট অবনত-মস্তক হইলেন। তাঁহারা আর এই ঘোরতর আত্ম-বিগ্রহে আত্ম-পক্ষের ধ্বংস দেখিতে পারিলেন না। স্থানান্তরে যাইয়া শান্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইল। এই উদ্দেশে তাঁহারা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া 'হিন্দু' * নামে পরিচিত হইলেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত উভয় সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন।

* সংস্কৃতে এই 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নাই। পশুপালক আর্য্যগণ যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশ-ত্যাগী হন, বোধ হয় তাঁহাদের ভাষার নিয়ম অনুসারে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পশুপালকগণ প্রথমে সিন্ধু নদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এই সিন্ধু হইতে 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কৃষিজীবিগণ 'হপ্তহেন্দুর' বিষয় অবগত ছিলেন। এই 'হপ্তহেন্দু' সংস্কৃত সপ্ত সিন্ধু ব্যতীত আর কিছুই নহে। সিন্ধু ও তাহার পাঁচ শাখা এবং সরস্বতী বা কাবুল বোধ হয়, এই সাত নদী সপ্ত সিন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে যে, 'হিন্দু'র উৎপত্তি হইয়াছে, এই সপ্ত সিন্ধুর বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এদিকে কৃষিজীবীরাও দীর্ঘকাল আপনাদের পূর্ব্ব-নিবাস-ভূমিতে থাকিলেন না। তাঁহারা ক্রমে পারস্যে যাইয়া পারসীক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এইরূপে উভয় দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও দেবতা-বিশেষের আরাধনা হইতে বিযুক্ত হন নাই। অগ্নি উভয় দলের মতেই পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন। উভয় দলই সমান ভক্তির সহিত সূর্য্যের আরাধনা করিতে থাকেন। কিন্তু দেবতাদিগের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনে উভয় দলের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঋগ্‌বেদ এই ভারতবর্ষ-প্রবাসী আর্য্যদিগের এবং অবস্তা পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। বৈদিক আর্য্যেরা দেবগণের উদ্দেশে নূতন নূতন স্তোত্র রচনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তীগণ পুরাতন বিষয়েই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। বৈদিক আর্য্যেরা দেবগণের নিকট সর্ব্বদা অভিনব চারণ-ভূমি প্রার্থনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তীরা এক স্থানে থাকিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। বৈদিক আর্য্যেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তীরা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থানের সীমার মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন। বৈদিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ উদ্ভাবনা, মনীষা ও গবেষণায় পরিপূর্ণ, অবস্তার অনুবর্ত্তীগণের ধর্ম্মগ্রন্থ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সমষ্টি। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা সংস্কারক এবং অবস্তার অনুবর্ত্তীরা রক্ষণশীল। এই সংস্কারক বৈদিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে সভ্যতা-জ্যোতি প্রসারিত করিয়াছেন। এদিকে রক্ষণশীল আর্য্যগণ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্ম্মোন্মত্ত যবনদিগের পরাক্রমে আপনাদের আবাস-

ভূমি পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। যে কেল্ট ও টিউটনদিগের আদিপুরুষগণ প্রথমে আপনাদের আদি নিবাস-স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের সন্তানগণও এখন এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপে মৃগয়াজীবী, পশুপালক ও কৃষিজীবী আর্য্যগণ এক সময়ে মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত ভূখণ্ডে একত্র থাকিয়া বহু শতাব্দী পরে এখন ভারতের প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এখন এই বহু শতাব্দীর বিযুক্ত তিন সম্প্রদায়েরই সম্মিলন-স্থল হইয়াছে। আশা আছে, এই সম্মিলনে ইহাঁদের ভ্রাতৃভাব প্রশস্ততর হইবে। ইহাঁরা আপনাদের পূর্ব্বতন বিদ্বেষ ভুলিয়া এই দেশের উন্নতির জন্য একপ্রাণতা ও সমবেদনা দেখাইতে অগ্রসর হইবেন।

দ্বিতীয় পাঠ।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের বসতি ও সভ্যতা বিস্তার।

(খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৩০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে
১০০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

আর্য্যদিগের পঞ্জাবে আগমন—ভারতবর্ষে আসিবার পথ—ভারতবর্ষের আদিম জাতি (দস্যু)—আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে বৈষম্য—আর্য্যদিগের সহিত দস্যুদিগের যুদ্ধ—ব্রহ্মাবর্ত্ত—ব্রহ্মর্ষি—মধ্যদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত—আর্য্য-রাজগণ—সমাজের সাধারণ অবস্থা—পুরোহিত—জনসাধারণ—আর্য্য মহিলা-গণ—আচার ব্যবহার—ধর্ম্ম-প্রণালী—সাহিত্য।

আর্য্যদিগের পঞ্জাবে আগমন।

হিন্দু আর্য্যগণ আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। আফগানিস্তানে অনেকগুলি চারণ-ভূমি ছিল। গবাদি জীব প্রসন্নভাবে এই সকল ভূমিতে চরিয়া বেড়াইত। আর্য্যেরা কিয়দংশে আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এজন্য কোন স্থানে উঠিয়া যাইতে, ইহাঁদের প্রথমে প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহাঁরা আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। দুর্নিবার আত্মবিগ্রহ ইহাঁদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহাঁরা অবশেষে আপনাদের প্রিয়তম আবাস-ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ আগ্রহে ইহাঁদের স্বদেশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য দলে দলে মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেরূপ

সাহসিকতায় তাঁহারা আদিম জাতিকে পরাস্ত করিয়া গ্রীশে, ইতালিতে, রুশিয়ায় ও জর্ম্মণিতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে পশুপালক আর্য্যগণও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সেইরূপ আগ্রহ ও সেইরূপ সাহসিকতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহই আর আফগানিস্তানে রহিল না, সকলেই দল বাঁধিয়া হিমালয়ের পরপারে যাইতে প্রস্তুত হইল।

ভারতবর্ষে আসিবার পথ।

আর্য্যেরা গিরি-সঙ্কট পার হইয়া প্রথমে পেশাবরের নিকটে উপনীত হন। সুদূর-বিস্তৃত হিমগিরি অনেক স্থলে ইহাঁদের আসিবার পথে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ইহাঁরা কিছুতেই কুণ্ঠিত বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। ইহাঁদের সাহস, উৎসাহ ও একাগ্রতা তখন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাঁরা দলবলের সহিত অমিত বিক্রমে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করেন। যেখানে বেগবতী তরঙ্গিণী তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিয়া ইহাঁদের গমনের অন্তরায় হয়, সেখানে ইহাঁরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হন। ইহাঁদের উৎসাহ বা উদ্যম কোনও স্থানে পর্য্যুদস্ত হয় নাই। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা বিপুল উৎসাহ সহকারে গিরি-পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ভারতবর্ষের আদিম জাতি (দস্যু)।

ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যেরা প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য হইলেন না। যে শান্তি লাভের আশায় ইহাঁরা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়াছিলেন, এবং আপনাদের স্নেহ-পালিত গোধনের চারণ-ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাঁদের অদৃষ্টে প্রথমেই সে শান্তি-সুখ ঘটিয়া উঠিল না। ইহাঁরা স্বদেশীয়

শক্রর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, বিদেশীয় শক্রর হাতে পড়িলেন। এই বিদেশীয়গণ আর্য্যদিগকে সহজে স্থান দিল না। ইহারা আপনাদের আবাস-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে আর্য্যেরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া দলবলের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অমনি ফিরিলেন না; ভারতবর্ষবাসী অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া তাঁহারাও সমর-সজ্জার আয়োজন করিলেন। যে কাণ্ড আফগানিস্তানে ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহারই অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে নর-শোণিত-স্রোত বহিল। আর্য্যদিগের এই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ভারতবর্ষের আদিম জাতি। বেদে ইহারা দস্যু অথবা দাস নামে উক্ত হইয়াছে।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে বৈষম্য।

আর্য্যেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভাল প্রণালী অবধারণ করিতে পারিতেন, দস্যুরা এরূপ এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। আর্য্যদিগের মধ্যে সমাজ-তন্ত্র ছিল, সকলে উৎকৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেন, দস্যুগণের মধ্যে এরূপ সমাজ-তন্ত্র ছিল না, সমাজের উন্নতির জন্য ভাল ব্যবস্থাও প্রণীত হইত না।* আর্য্যেরা যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। দস্যুরা সামরিক রীতি কিছুই জানিত না, তাহাদের ভাল রকম অস্ত্র শস্ত্রও ছিল না। কোন বিষয়ে একবার অকৃত-

কার্য্য হইলে আর্য্যেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার ভাল উপায় অবধারণ করিতেন, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন, দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধি-বল ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন, এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়-শ্রী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, ভক্তি-ভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন; দস্যুদিগের এরূপ ঈশ্বর-নিষ্ঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই গৌরব করিত। আর্য্যেরা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে একত্র হইতেন; এই সকল সমিতিতে সাহসী ও প্রতিভা-শালী, সুযোদ্ধা ও সুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন, দস্যুদিগের এরূপ সমিতির সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। আর্য্যেরা অরাতিদিগকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখ-যুদ্ধ ব্যতীত ইহাঁরা আর কোনরূপে শত্রুর অনিষ্ট করিতেন না, দস্যুরা সকল সময়ে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইত না, তাহারা অনেক সময়ে লুকাইয়া থাকিয়া, সুযোগ ক্রমে শত্রুপক্ষের খাদ্যসামগ্রী বা সম্পত্তি হরণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইত। আর্য্যেরা সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুরা খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল; সংক্ষেপে সভ্যতার অনতিস্ফুট আলোক আর্য্যদিগকে ক্রমে উদ্ভাসিত করিতেছিল, অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দস্যুদিগকে একবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের

অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখান ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময় হিন্দু আর্য্যেরা আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যদিগের সহিত দস্যুদিগের যুদ্ধ।

আর্য্যেরা পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেই দস্যুরা তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ইহারা অভিনব আক্রমণকারীদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল না। সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। আর্য্যেরা এই অসভ্যদিগের সাহস ও স্বদেশ-ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হই-লেন। তাঁহারা আপনাদের অধ্যুষিত স্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহা-দের সৈন্যগণ প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অনেকগুলি দল সংগঠিত হইল। প্রতি দলের এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা গোচর্ম্মে আচ্ছাদিত অশ্ব-চালিত যুদ্ধ-রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সমর-দেবতার স্তুতি-গীতি গাইতে গাইতে আপন আপন সৈন্য চালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পতাকা সকল ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক দলে শোভা পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের কেহ ধনু ও তীর, কেহ বড়শা বা তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ আপনাদের সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া

দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুরা ইঁহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না, আপনাদের শস্য-পূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে তরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নানা-বিধ উপহার দিয়া বিজেতাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। দস্যুদিগের যে সকল জনপদ অধিকৃত হইল, আর্য্যেরা তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে অসভ্য দস্যু-জনপদে আর্য্য-রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হইল এবং আর্য্য-দেবগণ স্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপনাদের অধিকৃত এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমস্ত দস্যু-জনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হয় নাই। এ যুদ্ধ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের এই আদিম অসভ্য জাতি, প্রবল পরাক্রান্ত, সহায়-সম্পন্ন বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না; কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপ-নাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল, কেহ বা বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। হিন্দু আর্য্যদিগের ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। এখন ভারত-বর্ষে খস, গারো, পুলিন্দ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক আদিম দস্যুদিগের সন্তান। এই দস্যু-সন্তানগণ সাহসী, যুদ্ধকুশল ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। ইহাদের সহিত সদ্ব্যব-

হার করিলে ইহারা সদ্ব্যবহারকারীর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ ইহাদের সাহস ও ইহাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়াই দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়ী হন, এবং পলাসীর রণক্ষেত্রে বিজয়-শ্রী অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানীর পদানত করেন।

ব্রহ্মাবর্ত্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্যগণ পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথমেই একবারে সমস্ত পঞ্জাব বা তাহার বহিঃস্থ ভূভাগ তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্য্য সেনাপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দস্যু-জনপদের অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটি বিশেষ ভূখণ্ডে সকলে বাস করিতেন। এই ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে বালুকা-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষদ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল এবং বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল।

ব্রহ্মর্ষি।

আর্য্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ব্রহ্মাবর্ত্তে যখন তাঁহাদের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর তাঁহারা যে জনপদে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত। এই প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের নিকটে,

মৎস্যদেশ এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে এবং মথুরার ৮৩ মাইল পশ্চিমে। কেহ কেহ কহেন, বর্ত্তমান জয়পুর-রাজ্যের কোন কোন অংশ মৎস্যদেশের অন্তর্গত। পঞ্চালের বর্ত্তমান নাম কান্যকুব্জ বা কনৌজ, শূরসেন বর্ত্তমান মথুরা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বংশ বৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তৃত হয়।

মধ্যদেশ।

ব্রহ্মর্ষির পর আর্য্যেরা যে স্থানে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম মধ্যদেশ। মনুসংহিতার মতানুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী।

আর্য্যাবর্ত্ত।

মধ্যদেশের পর আবার উপনিবেশের সীমা বৃদ্ধি পাইল। আর্য্যদিগের বংশ যখন এত বাড়িয়া উঠিল যে, মধ্যদেশেও সকলের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা আপনাদের আবাসের জন্য চতুর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কালকবন বা বর্ত্তমান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ সীমা পারিযাত্র বা বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং পশ্চিম সীমা আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ব্বত। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্প্রসারিত হয়। মনু-সংহিতার মতে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সাগর, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিম সাগর।

আর্য্যেরা যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশ-স্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। আর্য্যদিগের বংশ-বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের

আবাস-স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণা-পথে বসতি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই সমুদয় স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন নাই।

আর্য্য রাজগণ।

হিন্দু আর্য্যগণ যখন দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন ভারতবর্ষে অভিনব শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রধান প্রধান আর্য্য পুরুষেরা দরবারে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে ইঁহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, আর্য্য গোষ্ঠীপতি, আর্য্য যাজ্ঞিক ও আর্য্য সেনাপতি। সমাজে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই সম্মান ও মর্য্যাদা ছিল। রাজাদের অন্তঃপুর ছিল। তাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। মৃগয়ায় তাঁহাদের আসক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা সুবিস্তৃত আরণ্য প্রদেশে যাইয়া পশু-হননে প্রবৃত্ত হইতেন। আরাধ্য দেবতার পূজায় এবং পুরোহিতদিগকে ধনদানে তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছিল না। সামন্তগণ তাঁহাদের সহচর ছিল। তাঁহারা এই সমস্ত সহচরে পরিবৃত হইয়া চারণদিগের মুখে প্রশংসা-গীতি শুনিতে শুনিতে আপনাদের আড়ম্বর-প্রিয়তা দেখাইতেন।

সমাজের সাধারণ অবস্থা।

এই সময়ে হিন্দু আর্য্য-সমাজের সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীপতি পরিষ্কৃত ও সুন্দর গৃহে বাস করিতেন। তিনি যথানিয়মে রূপলাবণ্যবতী কামিনীদিগকে

বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিতেন। তাঁহার বহুসংখ্য অনুচর ও গৃহপালিত পশু থাকিত। দেব-সেবার উপলক্ষে তিনি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অগ্রে তিনি ভোজন-স্থানে উপবিষ্ট না হইলে কেহই ভোজনে প্রবৃত্ত হইত না। আত্মপ্রাধান্য ও সমাজে আপনার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অনুচরবর্গের সহিত প্রস্তুত থাকিতেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিমুখ হইতেন না। তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধ-বেশে থাকিতেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার দেহ রক্ষা করিত এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও বড়শা তাঁহার হস্তে শোভা পাইত। তিনি গলদেশে হার ও কর্ণে বলয় ধারণ করিতেন। কি রূপে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় বীরত্ব দেখান যায়, ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় ছিল। প্রকৃত যুদ্ধবীর হওয়া তিনি ধর্ম্মসম্মত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকট স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক আবাস-গৃহ, এই তিনটি তাঁহার প্রার্থনার বিষয় ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক, যুদ্ধ-বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। যুদ্ধে বা ভোগ-বিলাসের দ্রব্য-সংগ্রহে তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহায়তা করিত। এজন্য তিনি দেবতাদের নিকট সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান প্রার্থনা করিতেন। পরিবারপ্রতিপালন ব্যতীত অধিকৃত জনপদের শান্তিরক্ষা-কার্য্যেও তাঁহার মনোযোগ ছিল। তিনি একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন। তদীয় ধর্ম্মপত্নীগণ উপাসনা-স্থলে বা উৎসব-ভূমিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরোহিতেরা তাঁহার দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া

থাকিতেন। প্রাত্যহিক উপাসনা-কার্য্যে এই পুরোহিত তাঁহার সহায়তা করিতেন। এই সময়ে এক এক জন উদ্গাতা (গায়ক) স্তোত্র গান করিতেন। এই গায়কেরা কেবল পুরাতন স্তোত্র গান করিতেন না, সময়ে সময়ে অভিনব স্তোত্রও রচনা করিতেন।

মহিলাগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহাদের বেশভূষার ক্রমে পারিপাট্য হইয়াছিল। তাঁহারা যখন স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারিতেন, তখন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। কেহ কেহ বা চির-কুমারী হইয়া থাকিতেন। যুদ্ধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অশ্ব ও হস্তী, উভয়কেই যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিল্পীরা নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রধান প্রধান লোক এই সকল দ্রব্য অনেক পরিমাণে কিনিয়া লইতেন। শ্রমজীবীরা যথা-নিয়মে আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য পাইত। সাহস করিয়া কেহ কোন মহৎ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলে সকলেই তাহাকে উৎসাহিত করিত। এইরূপে আর্য্যদিগের সাহস ও পরাক্রম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিত, ক্রমেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকার বাড়াইতে অগ্রসর হইতেন।

পুরোহিত।

আর্য্য-সমাজে পুরোহিতের বিশেষ আদর ও মর্য্যাদা ছিল। রাজা ও গোষ্ঠীপতিগণ, সকলেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন, সকলেই তাঁহার অভিলাষ পূরণে চেষ্টা পাইতেন, এবং সকলেই উপাসনা-সময়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। পুরোহিত সর্ব্বদা রাজ-দরবারে যাইতেন; রাজার অন্তঃপুরেও তাঁহার গমন নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু তিনি শাসন-

সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ক্ষমতা কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়েই আবদ্ধ থাকিত। সুতরাং শাসনকর্ত্তা বা সেনাপতিদিগের ন্যায় তিনি আপনার আধিপত্য দেখাইতে পারিতেন না। এরূপ হইলেও পুরোহিতের পদ-গৌরব কোন অংশে হীন ছিল না। তাঁহার অনেক ধনরত্ন, অনেক ভূসম্পত্তি ও অনেক অনুচর থাকিত। তিনি রাজার নিকট হইতে এক শত গাভী, রথ, অশ্ব, বহুমূল্য গাত্র-বস্ত্র ও বহুসংখ্য দাস পাইতেন। সুতরাং পুরোহিত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। গোষ্ঠীপতিগণ অনেক বিষয়েই পুরোহিতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। পুরোহিত উপস্থিত না হইলে প্রভাতে ও সায়ংকালে দেবতার আরাধনা বা পবিত্র অগ্নিকে উপহার দেওয়া হইত না। পুরোহিত যথানিয়মে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে সমিতি হইত। এই সকল সমিতিতে সকলে সমবেত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা করিতেন। যে সকল ছাত্র ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিত, তাহাদের পরীক্ষা লইয়া, উপযুক্ত ছাত্রদিগকে এই সময়ে পুরো-হিত-পদে বরণ করা হইত। এই উপাধিদানের রীতি আড়ম্বর-শূন্য ও সরল ছিল। সমিতিস্থ বৃদ্ধ পুরোহিত ও শিক্ষকগণ সম্মত হইলে শিক্ষার্থিগণ প্রশংসা-পত্র পাইত। যে ছাত্র পরী-ক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত, তাহাকে কৃষক হইয়া হল চালনা করিতে হইত। সমাজে পুরোহিতের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহারা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহা লোকে কেবল পার্থিব সুখের দ্বার বিবেচনা করিত না,

প্রত্যুত দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র উপায় মনে করিত। সুতরাং সাধারণে দেবগণকে প্রীত করিবার জন্য ও সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সুখ পাইবার আশায় পুরোহিতের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া থাকিত। এইরূপ প্রাধান্য পাওয়াতে পুরোহিতগণ ক্রমে সমাজে আপনাদিগকে অসীম-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। সময়ে এই অসীম-শক্তি-সম্পন্ন পুরোহিত হইতে ভারতবর্ষে সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

জনসাধারণ।

রাজা ও পুরোহিতের পর জনসাধারণ হিন্দু আর্য্য-সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহারা প্রধানতঃ কৃষি-কার্য্য করিত। এ সময়ে কৃষিকার্য্য সকলেরই অভ্যস্ত ছিল। পুরোহিত আপনার কার্য্যে অপারগ হইলে হল চালনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সেনাপতি যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হইলে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। গোষ্ঠীপতি সমাজের শাসন-কার্য্য হইতে অবসর লইলে কৃষি-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইতেন। ভূমি চাস করা সকলেই একটি পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিত। কেহই এই পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইত না। যখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত, তখন সকলে আপনাদের গোরু ও লাঙ্গল কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে করিয়া অরাতি নিপাতে বহির্গত হইত। যাহা হউক, কৃষি-কার্য্যের এইরূপ আদর থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য ব্যবসায় অপ্রচলিত ছিল না। বণিকেরা স্থলপথে বা জলপথে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইত। এই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি

ছিল। কর্ম্মকারেরা স্বর্ণের নানাবিধ আভরণ, লৌহের নানাবিধ অস্ত্র ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। সাধারণতঃ পশম ও কার্পাস-বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শিল্পীরা ভোগ-বিলাস-রত মহিলাদের জন্য বিশেষ পারিপাট্যশালী বস্ত্র প্রস্তুত করিত। তুষার-ধবল বস্ত্রেরই মুল্য অধিক ছিল। সূচীকার্য্যের আদর ছিল। অনেকে দরজীর কাজ করিত। জনসাধারণের মধ্যে চুক্তি-সংক্রান্ত আইন অপ্রচলিত ছিল না। সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়ার প্রথা ছিল। কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত হারে সুদ গৃহীত হইত। কৃষি-ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত; এদিকে শিল্পজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত। সুতরাং সাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন কষ্ট ছিল না। এই সময়ে কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্র-সমূহে যথাসময়ে জল সেচন জন্য, স্থানে স্থানে কূপ খনিত হইত। হিন্দু আর্য্য সম্প্রদায়ের সকলেই প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন, সকলেই প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর শুচি হইয়া পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন, এবং সকলেই ভক্তি-রসার্দ্র হৃদয়ে নানাবিধ উপহার দিয়া সেই অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। জনসাধারণ উষার উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র গান করিত, তৎসমুদয়ে তাঁহাদের কার্য্য-তৎপরতা পরিস্ফুট হইত। উষার স্তুতির পর সাহসী যোদ্ধারা বিপক্ষের ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইত; কেহ কেহ শান্ত-ভাবে গোধন সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যাইত, কেহ বা আপনাদের অবলম্বিত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিত।

আর্য্য-মহিলাগণ।

এই সময়ে আর্য্য-মহিলাগণের অবস্থা একবারে নিকৃষ্ট ছিল না। ইহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইতেন, দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারিণী ছিলেন, এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্ববারা নামে একটি মহিলা ঋগ্বেদের কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু আর্য্য-মহিলাদিগের সুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিক বয়স না হইলে, এবং স্বয়ং পতি মনোনীত করণের ক্ষমতা না জন্মিলে, আর্য্য মহিলাগণ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। কেহ কেহ চিরকুমারী হইয়া থাকিতেন। চিরকুমারীরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। মহিলাদের যথোচিত সম্মান ও সমাদর ছিল। ইঁহারা উপস্থিত হইলে পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, গর্ভবতী রমণী ও বালক বালিকাদের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। ধর্ম্ম-পরিণীতা বনিতা যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত না হইলে গৃহস্থের যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইত না। আর্য্য-মহিলাগণ এখনকার মত সর্ব্বদা অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ থাকিতেন না। উপাসনা-স্থলে বা উৎসব-ভূমিতে স্বামীর সহিত ইহাঁদের আগমন প্রতিষিদ্ধ ছিল না। স্বামীকর্ত্তৃক নিষিদ্ধা না হইলে ইঁহারা অপর লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন। স্বামী বিদেশে থাকিলে মহিলারা অপরের বাটীতে যাইতেন না, এবং উৎসব স্থলে বা প্রকাশ্য সমিতিতে উপস্থিত হইতেন না। এই সময়ে তাঁহারা ঘরে বসিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন। আর্য্য মহিলারা কঞ্চুলিক (কাঁচুলী) পরিধান করিতেন, এবং শীলতা রক্ষার জন্য চাদরে মস্তক আবৃত রাখিতেন। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা

কাঁচুলীর উপর আঙ্গিয়া (কুর্ত্তা) ধারণ করিতেন। এখনকার মত ঘোমটা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। আর্য্য মহিলারা স্বর্ণা-ভরণ ধারণ করিতেন। তাঁহাদের কেশগুচ্ছ খোঁপার ন্যায় মস্তকের দক্ষিণ ভাগে থাকিত। স্বর্ণময় শিরোভূষণ এই কেশ-গুচ্ছের উপর শোভা পাইত। এই সময়ে সহমরণ-প্রথা প্রচ-লিত ছিল না। বিধবারা পতির মৃতদেহের নিকটে কিছুকাল শয়ন করিয়া উঠিয়া আসিতেন, পরে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে মৃত ভর্ত্তার ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃপত্নীর বিবাহ হইত। সাংসারিক কার্য্যের ভার গৃহিণী-দিগের উপর সমর্পিত ছিল।

বৈষয়িক কার্য্যের তারতম্য অনুসারে আর্য্য-সম্প্রদায় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

আচার ব্যবহার।

তিন শ্রেণীর লোকই আপনাদের অবস্থামত সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। এই সময়ে কোন কোন গৃহ দ্বিতল ছিল। গৃহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাদৃশ আড়ম্বর ছিল না। মাটীর দেয়াল দিয়া মোটামুটি ভাবে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। কিন্তু গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ছিল। কোন গৃহই অপরিষ্কার থাকিত না, কোন গৃহই স্বাস্থ্যের হানি করিত না, এবং কোন গৃহই বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখা যাইত না। গৃহে যাইবার পথ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিত। পথের পার্শ্বে রমণীয় পুষ্পবৃক্ষ সকল রোপিত হইত। বিশ্বস্ত কুকুর গৃহ-দ্বার রক্ষা করিত। গৃহের মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে দেবা-রাধনা ও যজ্ঞের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। এইখানে পবিত্র অগ্নি থাকিত। এই উপাসনা-ভূমির প্রতি আর্য্যদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও

ভক্তি ছিল। ইহা কোন প্রকারে অপবিত্র হইলে সকলে আপনাদিগকে প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহা সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। এই যজ্ঞভূমি দর্শনে হিন্দু আর্য্যদিগের হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহের উদয় হইত, অভিনব আশা ও উৎসাহের সহিত আর্য্যেরা এই যজ্ঞ-ভূমিতে সমবেত হইতেন। প্রাতঃকালে ও সায়ন্তন সময়ে গৃহস্বামী স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া পুরোহিতের সাহায্যে পবিত্র অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ছোট ছোট বালক বালিকারা সমস্বরে পবিত্র স্তোত্র গান করিত। এখন আমাদের মধ্যে কৌষেয় বস্ত্র যেমন পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, আর্য্যদের মধ্যে তেমনি শ্বেত পরিচ্ছদের পবিত্রতা ছিল। পুরোহিত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; গৃহস্বামী শ্বেত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উপাসনা-ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। দুর্গ সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকিত। এই সময়ে কৃষিক্ষেত্র, গোচরণস্থান, ও গাভী আর্য্যদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। আর্য্যেরা গাভীদিগকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেন। গোদোহ একটী পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গোষ্ঠীপতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। গাভীদিগকে পরিষ্কৃত স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। আর্য্যগণ সংযত চিত্তে প্রত্যেক গাভীকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র মন্ত্র উচ্চাচরণ করিতেন, ইহার পর বৎসের দুগ্ধ পান শেষ হইলে পর্য্যায় ক্রমে এক একটি গাভী দোহন করা হইত। হিন্দু আর্য্যগণ গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতির মাংস আহার করিতেন। তখন গোহত্যার নিষেধ-বিধি ছিল না। অতিথি সমাগত হইলে আর্য্যেরা তাহাকে গো-বৎসের মাংসে সন্তৃপ্ত করিতেন। সোমরস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া

সুপেয় সুরা প্রস্তুত করা হইত। আর্য্যেরা এই সুরার বড় ভক্ত ছিলেন। ইহার ঘ্রাণে তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন, ইহার স্পর্শে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিতেন, এবং ইহার আস্বাদে তাঁহারা অভিনব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া মহত্তর কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতেন। বিবাহের সময় বর কন্যার গাত্রে দুগ্ধ ও মাখম মাখাইয়া দেওয়া হইত। কন্যা-কর্ত্তা সমৃদ্ধ হইলে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য যৌতুক দিতেন। কোন কোন সময়ে এক হাজার গাভী দেওয়া হইত। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নিয়ম ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন। পুত্রের অবর্ত্তমানে দৌহিত্র মাতামহের সম্পত্তি অধিকার করিত। উত্তরাধিকার ও ধর্ম্ম-কার্য্যের সম্বন্ধে সর্ব্বদা প্রবীণদিগের মত গ্রহণ করা হইত। যাঁহাদের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তাঁহাদের উপর এই সকল গুরুতর বিষয়ের বিচার-ভার সমর্পিত হইত না।

আর্য্যেরা যখন মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মৃত দেহ সমাধিস্থ বা দগ্ধ করার প্রথা ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে তদীয় শব নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বা কোন নিভৃত স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইত। বোম্বাই-নিবাসী পারসীকদিগের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত আছে। ইঁহারা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে নিক্ষেপ করেন। যাহা হউক, আর্য্যেরা যখন কৃষিজীবীদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ-স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা এই প্রণালীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালী তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বনে প্রবর্ত্তিত

করে। ইহার পর স্বাস্থ্যের উপদেশ, দেশের জল বায়ুর অবস্থা ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তি-নিচয় এইরূপ সংস্কারের অনুকূল হয়। ভক্তি-ভাজন জনক জননী, স্নেহাস্পদ সন্তান, প্রেমময়ী প্রণয়িনীর দেহ শৃগাল, কুকুর বা মাংসাশী পক্ষীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহা মনে হইলে কাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়? হিন্দু আর্য্যেরা ক্রমে এইরূপ ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। মৃত দেহ স্থানবিশেষে ফেলিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে উহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করার নিয়ম হইল। বলদদ্বয়-চালিত রথে মৃত দেহ স্থাপনপূর্ব্বক সমাধি-স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এখন যেমন হিন্দুদের মধ্যে স্বজাতি ভিন্ন আর কেহ মৃত দেহ স্পর্শ করিতে পারে না, পূর্ব্বে তেমন নিয়ম ছিল না। রথের অভাবে বাড়ীর প্রাচীন দাস শব লইয়া যাইত। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পত্নী তাহার পার্শ্বে শয়ন করিতেন। এক জন আত্মীয় অথবা বিশ্বস্ত ভৃত্য এই মৃতভর্তৃকাকে সম্বোধন করিয়া কহিত, "শুভে! তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে শয়ন করিয়াছ, এখন উঠিয়া জীবলোকে আইস। যে তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী, তাহার সহিত আবার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হও।" রমণী উঠিয়া আসিতেন। মৃতের হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিত। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি এই ধনুর্ব্বাণ খুলিয়া লইত। পরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। অতি প্রাচীন সময়ে হিন্দু আর্য্য-সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল। ইহার পর দাহ করিয়া ভস্মাবশেষ মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিবার প্রথা হয়। খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভ হইতে দাহাবশিষ্ট ভস্মাদি প্রোথিত করার পরিবর্ত্তে জলসাৎ করার নিয়ম হয়। এখনও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা ছিল। গায়ে চাপকানের মত এক প্রকার লম্বা অঙ্গাবরণ থাকিত। যুদ্ধ-যাত্রীরা কোমরবন্ধ ব্যবহার করিত। মাথায় চাদর বান্ধা হইত। চাদরের উভয় পার্শ্ব পশ্চাদ্দেশে ঝুলিতে থাকিত। পাদুকার মধ্যে এক প্রকার চটি জুতা প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা কর্ণে বলয় ও গলদেশে হার ধারণ করিতেন। এখন হিন্দুস্থানীরা যেমন কতক গুলি মোহর গাঁথিয়া গলায় পরে, সম্ভবতঃ আর্য্যেরা তখন স্বর্ণ-মুদ্রা সকল তেমন করিয়া গলায় দিতেন। মহিলাগণের মধ্যে কর্ণাভরণ, শিরোভূষণ, হার, বালা, তাবিজ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে স্বর্ণাসন, ভোজন-পাত্র, পান-পাত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্য্যেরা চর্ম্ম-নির্ম্মিত থলিয়াতে জল রাখিতেন। এই থলিয়া চর্ম্মভাণ্ড নামে অভিহিত হইত। সমুদ্র-যাত্রার জন্য ও নৌকা নির্ম্মাণের প্রথা ছিল।

এই সময়ে হিন্দু আর্য্যেরা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সমুদয় আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ ও সংস্কৃত প্রণালীর অনুমোদিত ছিল না। তাঁহারা যখন কোন বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইতেন, তখন আপনাদের কল্পনা-বলে সেই বিষয়টি অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে নানা প্রকার কুসংস্কারের আবির্ভাব হয়। সূর্য্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইলে আর্য্যেরা ভাবিতেন, কোন ক্ষমতাশালী দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এজন্য পুরোহিতগণ কাতর স্বরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিতেন। এই সময়ে কামল ও খাপ

রোগের প্রাচুর্ভাব ছিল। এই কামল ও শ্বাস-রোগীর দেহের উপর পবিত্র স্তোত্র পড়িয়া উপশম প্রার্থনা করা হইত। এখন যেমন আমাদের দেশে "ঝাড় ফোঁকের" নিয়ম আছে, প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যেও সেইরূপ পদ্ধতি ছিল। পবিত্র মন্ত্রের উপর আর্য্যদিগের অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, এই মন্ত্রবলে তাঁহাদের দেবগণ সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে।

ধর্ম্মপ্রণালী।

প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ যখন মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত মাল-ভূমিতে অথবা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিলেন, তখন তাঁহারা প্রকৃতি-রাজ্যের এক একটি বিশেষ শক্তিকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেন। ইহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষে সমাগত হইলেন। অনন্তর-তুষার-মণ্ডিত হিমগিরি তাঁহাদের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন সলিল-বিধৌত শ্যামল ভূখণ্ড তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সঞ্চারিত করিল। এখানেও বায়ুর অসীম প্রভাব, সূর্য্যের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, অগ্নির তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের নিসর্গ-শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। চারি দিকের নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রভাব দর্শনে তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নৈসর্গিক দেবগণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। যজমানের নিকেতনে পূর্ব্বের ন্যায় বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা হইতে লাগিল। আর্য্যেরা অন্নাদি লাভের উদ্দেশ্যে বা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই সকল দেবতার স্তব করিতেন এবং ইহাঁদিগকে 'ফল,

মূল ও সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এ সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা এ সময়ে সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির প্রভাব দেখিয়া তৎসমুদায়ের উপাসনা করিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে বৃষ্টির প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন এবং সিন্ধু সরস্বতীর মনোহর শোভা ও শৈত্য-প্রভৃতি গুণ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তি-রসার্দ্র হৃদয়ে উহাদের উদ্দেশে স্তুতিগীতি গান করিতেন। ভারতবর্ষবাসী আর্য্যদিগের উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে এইরূপ সরল ও প্রশান্ত ছিল। তাঁহারা ঋগ্‌বেদের মন্ত্র মাত্র আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই স্থলে প্রাচীন আর্য্যগণের কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত হইতেছে;—"হে বায়ু! ধার্ম্মিকগণের উপর মধু বর্ষণ কর। হে নদীগণ! তোমরাও মধু বর্ষণ কর। হে লতাসকল! তোমরা মধুময় হও। হে পর্ব্বত! হে সমুদ্র! হে স্বর্গ! হে বৃক্ষ-হরিৎ পৃথিবি! হে উভয় লোক! আমাদের ধন রক্ষা কর। দূর-দর্শী সূর্য্য! শুভোদয় হও। চতুর্দ্দিক! প্রসন্ন হও। সুদৃঢ় পর্ব্বতগণ! নদি ও জল! প্রসন্ন হও। হে প্রশংসিত পর্ব্বতগণ! হে উজ্জ্বল নদীগণ! আমাদিগকে রক্ষা ও আশ্রয়দান কর।" সরল হৃদয় আর্য্যদিগের স্তোত্র সকল এইরূপ সারল্য-পূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেখিতেন, বায়ুদ্বারা তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইতেছে, সূর্য্য প্রাতঃকালে রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন-সামর্থ্য প্রদান করিতেছে, নদীদ্বারা তাঁহাদের বাসভূমি উর্ব্বর হইতেছে, তাঁহাদের গো মেষ সকল এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা ইচ্ছামত নদীর শীতল জল পান করিয়া

পরিতৃপ্ত হইতেছেন, পর্ব্বত তাঁহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা আপনাদের সুখবর্দ্ধন মানসে সরল ভাবে উহাদের স্তব করিতেন। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আগমন কালে সিন্ধুনদের প্রভাব দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এজন্য সিন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তিভাবে কহিয়াছেন, "পৃথিবী-হইতে স্বর্গে ধ্বনি উত্থিত হয়; সিন্ধু গৌরবের সহিত অবি-শ্রান্ত ধ্বনি করিতেছেন। সিন্ধু বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে আসিতেছেন; মেঘ হইতে যেন বজ্র-নিনাদ বাহির হইতেছে।" আর্য্যগণ সিন্ধুনদের তরঙ্গ-গর্জ্জন শুনিয়াই সবিস্ময়ে ভক্তি-ভাবে এইরূপ স্তুতিগীতি গাইয়াছেন।

সাহিত্য।

এই সময়ে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। হিন্দু আর্য্য-দিগের সমস্ত রচনা মুখে মুখেই চলিয়া আসিত। দেব-গণের উদ্দেশে অনেক কবিতা রচিত ও গীত হইত। এই সকল কবিতা ঋগ্‌বেদের মন্ত্র নামে এখন সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে। এই স্থলে বলা উচিত যে, বেদ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত। বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্, এই তিনটি অংশ আছে। সংহি তায় সরল ভাবে উপাসনার মন্ত্র, ব্রাহ্মণে আড়ম্বর-পূর্ণ যাগ যজ্ঞের পদ্ধতি এবং উপনিষদে পরমার্থ-চিন্তা-ঘটিত আলোচন রহিয়াছে। এ সময়ে ঋগ্‌বেদের সংহিতামাত্র আর্য্যদিগে প্রধান সাহিত্য ছিল। এই সাহিত্যে বিবিধ ছন্দ বা অনুপ্রাসে অভাব নাই। অনেক স্থানে উদ্দীপনা, আবেগ ও কল্পনার লীলা তরঙ্গ রহিয়াছে। আর্য্যগণ দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদয়েই তাঁহাদের জাতীয় স্বভাব প্রতি-

ঋণিত হইয়াছে। এই সকল রচনা কোমলতা, উদ্ভাবনা ও উদ্দীপনা প্রভৃতি আদিম অবস্থার কবিত্ব-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। ইহার সকল স্থলেই সরলতা ও প্রশান্ত ভাব প্রতিভাসিত রহিয়াছে। হিন্দু আর্য্যগণ প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহের আবির্ভাব হয়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের এই সাহিত্যে তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মহিমা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যগণ সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই দেব-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা দেবগণের নিকট সুখাদ্য দ্রব্য, সুপেয় জল, সুস্থ সন্তান এবং বিপক্ষপরাজয়ের জন্য বিজয়িনীশক্তি প্রার্থনা করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যের সকল স্থলেই প্রশান্ত ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্ম্ম ভাবের আতিশয্য প্রযুক্তই আর্য্যেরা সকল সময়ে আপনাদের দেবগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।

তৃতীয় পাঠ।

(খ্রীঃ পূঃ ১০০০—খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ)

হিন্দু আর্য্যদিগের উন্নতি ও আধিপত্য।

হিন্দু আর্য্যদিগের অবস্থার উৎকর্ষ—জাতিবিভাগের আবশ্যকতা—ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্র—ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ফল—ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য—ব্রাহ্মণের পুনর্ব্বার প্রাধান্য লাভ—রামায়ণ ও মহাভারত—রাম রাবণের ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—মনু-সংহিতা—দেশের সাধারণ অবস্থা—অনার্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তি—উৎকর্ষ প্রাপ্তির তিন উপায়—আচার ব্যবহার—হিন্দুদিগের রাজনীতি—হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা—হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী—চারি আশ্রম।

হিন্দু আর্য্যদিগের অবস্থার উৎকর্ষ।

আর্য্যগণ কিরূপে ভারতবর্ষে উপনীত হন, কিরূপে ভারতবর্ষের অসভ্য দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে পঞ্চনদের এক অংশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিন্ধু দেশের কোন কোন স্থানেও তাঁহাদের আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা সিন্ধু সরস্বতী অতিক্রম করিয়া গঙ্গা যমুনার তটে উপনীত হন। বাসস্থানের সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সুখসৌভাগ্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের শাসন-বিধি এখন বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুরা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, কেহ কেহ তাঁহাদের আচার ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া তৎসমুদয়ের অনুকরণে চেষ্টা পাইতেছিল। তাঁহারা এখন ভারতবর্ষকে সুখ ও সৌভাগ্যের আকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র সকল তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য-সম্পত্তি দিতে লাগিল, দুগ্ধবতী গাভী তাঁহাদিগকে প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া সম্প্রীত করিতে লাগিল, এবং প্রসন্ন-সলিলা তরঙ্গিণী সুপেয় জল দিয়া তাঁহাদের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের উর্ব্বরা শক্তি ও মনোহর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন। এখন এই বিশ্ব সংসার তাঁহাদের নিকট সুখময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা এই সুখময় বিশ্বের কর্ত্তা দেবগণকে ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। এ দিকে সুখসৌভাগ্যের সহিত তাঁহাদের বিলাস-প্রিয়তা বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা স্বর্ণময় আভরণ ও সুবর্ণ-খচিত বস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রূপ-লাবণ্য-বতী মহিলারা নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া তাঁহাদের নিকট আপনাদের সৌন্দর্য্য-গরিমা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহারা জঙ্গলাদি দগ্ধ করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন বটে, কিন্তু জনপদের কিছু দূরে আপন ইচ্ছায় জঙ্গল রাখিয়া দিতেন। এই সকল জঙ্গলে নানাবিধ পশুপক্ষী থাকিত। হিন্দু আর্য্যেরা সময়ে সময়ে এই স্থানে মৃগয়া করিতে যাইতেন। আর্য্য রাজারা সুনিয়মে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরপতি, গ্রামপতিগণ ইহাঁদের অধীনে থাকিয়া আপনাদের গ্রামের উৎকর্ষ বিধানে চেষ্টা পাইতেন। কোন কোন গ্রামপতির অধীনে বিংশতি, কাহারও অধীনে শত, কাহারও অধীনে সহস্র গ্রামের কর্ত্তৃত্ব-ভার থাকিত। গোষ্ঠী-পতিদের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। আর্য্য মহিলা-দিগের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। পতি, পত্নীর

যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, কিন্তু শীলতার অনুরোধে বিবাহিতা মহিলারা সর্ব্বজন-সমক্ষে পতির সহিত সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারিতেন না। পুরোহিতেরা ক্রমে ক্রমে আপনাদের প্রাধান্য বাড়াইতেছিলেন। এইরূপে হিন্দু আর্য্য-সমাজ সকল দিকেই উন্নতি লাভ করিতেছিল। হিন্দু আর্য্যগণ সকল দিকেই আপনাদের মহিমা বিস্তার করিতেছিলেন। সভ্যতার সঙ্গে বিলাস-প্রিয়তার আবির্ভাব হইলেও তাঁহারা একবারে অলস, অপটু বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন নাই।

জাতি-বিভাগের আবশ্যকতা।

এই সময় হইতে হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে জাতি-বিভাগের প্রয়োজন হইল। এত দিন আর্য্য-সমাজে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী থাকিলেও শ্রেণী-ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভিন্নতা ছিল না। গোষ্ঠীপতিগণ এক সময়ে পুত্র পৌত্রগণের সহিত হলচালনায় নিবিষ্ট হইতেন, এবং আর এক সময়ে অশ্বারোহণে অসি হস্তে বাহির হইয়া শত্রু নিপাতে চেষ্টা পাইতেন। সেনাপতিগণ এক সময়ে রাজ্য শাসন করিতেন, অন্য সময়ে কৃষি-কার্য্যে মনোযোগী হইতেন, পুরোহিতগণ যজ্ঞাদির পর অবসর পাইলে গোধনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু এ অবস্থা আর দীর্ঘ কাল রহিল না। ক্রমে আর্য্যদের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন, ক্রমে রাজকীয় শাসন, সমাজ-শাসন ও কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্য গুরুতর হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে যাগ যজ্ঞ ও উপাসনার ঘটার বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল। গাভী ও কৃষি-ক্ষেত্র আর্য্যদিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল। কোনও রূপে এই সকলের অনিষ্ট হয়, ইহা তাঁহাদের

অভিপ্রেত ছিল না এ দিকে আর্য্যেরা সাতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন, কোনও প্রকারে উপাসনার ব্যাঘাত হইলে তাঁহারা নানা প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেন। ইহার পর আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে রাজ্য শাসন ও সময়ে সময়ে যুদ্ধাদি করিতে হইত। এখন এই সকল কার্য্য এক জনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর্য্যদের বংশ ও অধ্যুষিত স্থানের সীমা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল।

ব্রাহ্মণ।

সেনাপতি ও গোষ্ঠীপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান আর্য্যগণ যাঁহাদের সাহায্যে প্রাতঃকালে ও সায়ন্তন সময়ে পবিত্র অগ্নিকে উপহার দিয়া, উপাসনা করিতেন, যাঁহারা সমাজে আপনাদিগকে অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, আর্য্যগণ যাঁহাদের ক্ষমতা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন, সেই পুরোহিতগণ "ব্রাহ্মণ" নাম পরিগ্রহ করিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্যের উপর ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা রহিল। ইঁহারা উপস্থিত না হইলে পবিত্র অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত না, এবং ইঁহারা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ না করিলে উপাসনা সাঙ্গ হইত না। রাজা ও জনসাধারণের উপর, ইঁহাদের প্রাধান্য থাকিল। কেহই ইঁহাদের অবর্ত্তমানে কোন রূপ ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে সাহসী হইত না।

হিন্দু আর্য্যগণ যখন অসভ্য দাসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

ক্ষত্রিয়। করিতে সিন্ধুর তটদেশ হইতে ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন এক দল সাহসী যোদ্ধা তাঁহাদের সতীর্থগণ অপেক্ষা বিশেষ সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য দলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক দাসদিগের অনেক জনপদ আপনাদের অধিকার-ভুক্ত করেন। এই আর্য্য সেনাপতিগণই অধিকৃত জনপদের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। এখন এই সকল সেনাপতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই শ্রেণীর নাম "ক্ষত্রিয়" হইল। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যশাসন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। তিনি রাজনীতি ও যুদ্ধ-কার্য্য, উভয়ই যত্নের সহিত শিক্ষা করিতেন।

বৈশ্য। গবাদি জীবের প্রতিপালন ও কৃষি-কর্য্যের সম্পাদন জন্য আর এক দল লোক আবশ্যক হইল। যাঁহারা প্রথম হইতে এই সকল কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের অভ্যস্ত কার্য্যেই মনোনিবেশ করিলেন। ইঁহাদের নাম "বৈশ্য" হইল। বৈশ্যগণ আর্য্য-সমাজের তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন।

শূদ্র। ইহার পর আর এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। দাসদিগের অনেকে আর্য্যদের পদানত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের দল ছাড়িয়া আর্য্যদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ত্রুটি করে নাই। এই সকল পরাজিত দাস চতুর্থ শ্রেণী অধিকার করিয়া "শূদ্র" নামে পরিচিত হয়। প্রথম তিন শ্রেণীর আর্য্যগণ সাধারণতঃ দ্বিজ বলিয়া

অভিহিত হইতেন। ইঁহারা সকলে সমান ভাবে এক দেবতার আরাধনা করিতেন, এবং সকলে আপনাদের জাতীয় উৎসবে একত্র হইতেন। শূদ্রেরা এই দলভুক্ত ছিল না। ইহারা উপাসনা-স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না, এবং দ্বিজ বলিয়াও অভিহিত হইত না। আর্য্যদের দাসত্ব করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। ইহারা কৃষিক্ষেত্রে অস্থিভেদী পরিশ্রম করিত। বাড়ীর অপরিষ্কার কাজও ইহাদিগকে করিতে হইত। এইরূপ অস্থিভেদী পরিশ্রম ও এইরূপ অপরিষ্কৃত স্থানের অপরিষ্কৃত কাজ করিয়াও ইহারা প্রথমে বিজেতাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রভুগণ ইচ্ছা করিলে শূদ্রদিগকে তাড়াইতে পারিতেন, প্রহার করিতে পারিতেন এবং বধ করিতেও পারিতেন। ইহারা আর্য্যদের ক্রীত-দাস স্বরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে নিগ্রো ক্রীতদাসেরা যেমন ইউরোপীয়দিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে, প্রাচীন সময়ে বিজিত দাসদিগকে আর্য্য-বিজেতাদের হস্তে প্রথমে তেমনি নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ফল।

এই জাতি-বিভাগের পর ব্রাহ্মণেরা সমাজে অসীম প্রভুত্ব লাভ করিলেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহাদের এইরূপ প্রভুত্ব লাভের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এত দিন আর্য্যেরা দাসদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার ও বাসস্থান নির্ম্মাণেও তাঁহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত উপনিবিষ্ট জনপদে শস্য-সম্পত্তির উৎপাদন জন্যও তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু আর্য্যেরা প্রথম অবস্থায় সাহসী, উৎসাহশীল, কর্ত্তব্যপর, অধ্য-

বসায়-সম্পন্ন ও অনলস ছিলেন। তাঁহারা এ সময়ে অন্য কোন দিকে মন দিতেন না। কি রূপে শত্রুজয় হইবে, কি রূপে অধ্যুষিত ভূখণ্ড নিরাপদ থাকিবে, কি রূপে শস্য-সম্পত্তিতে আবাস-গৃহ পরিপূর্ণ রহিবে, ইহাই তাঁহাদের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্ত হইল, ক্রমে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও সাহসিক কার্য্যের স্থলে শান্তি ও সৌভাগ্য শোভা বিকাশ করিল। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বহু পরিশ্রমে ও বহু উৎসাহে ভারতবর্ষে যাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, এ সময়ে তদীয় সন্তানগণ তাহার ফল-ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন দাসগণ পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, ইহাদের অনেকে আর্য্য-সমাজে পরিগৃহীত ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিল, আবাসস্থানের সীমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং শস্য-পূর্ণ কৃষিক্ষেত্র সকল জনপদের চারি দিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। এখন আর্য্যেরা নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হইলেন। তাঁহাদের আর কোন ভাবনা রহিল না, তাঁহারা এখন ভোগ-বিলাসের জন্য লালায়িত হইলেন। সৌখীনতার তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদের সমাজে প্রবেশ করিল। ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বর্ণময় অলঙ্কারে শোভিত হইয়া সুবর্ণ-খচিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মানুষের দৌড় দেখিতে লাগিলেন। গায়কগণ মধুর সংগীতে তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। তাঁহারা সুসজ্জিত বিলাস-ভবনে থাকিয়া সুখময় স্বপ্নের বিভ্রম ও মোহিনী কল্পনার লীলা-চাতুরী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্যের সূত্রপাত হইল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, এখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন উপদ্রব

নাই, ভূপতিগণ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, কৃষি-ব্যবসায়ীরা আপনাদের ক্ষেত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইতেছে, ভোগ-বিলাসের সঙ্গে শিল্পজীবীদের উপজীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন সকলেই নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ ও নিরুপদ্রব। ব্রাহ্মণেরা এই নিরুপদ্রব সময়ে নানাবিধ যাগ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। আর্য্যেরা সাতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদের মন্ত্র-ভাগের অনুমোদিত সরল উপাসনা-প্রণালী তিরোহিত হইল। যাগ-যজ্ঞময় ব্রাহ্মণ-ভাগের গৌরব বৃদ্ধি পাইল। পুরোহিতেরা যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়াইতে ত্রুটি করিলেন না। যজ্ঞস্থলে এই আড়ম্বরের আদর দেখা যাইতে লাগিল। গৃহ-স্বামী ইহার গতি রোধ করিতে সাহসী হইলেন না। যজ্ঞের সময় পুরোহিতগণ একটি সুন্দর দোলাতে বসিতেন, লাবণ্যবতী নর্ত্তকীরা মৃদুমধুর বাদ্যের সহিত নৃত্য করিত, সুসজ্জিত ঘোটক সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, অদূরে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি শোভা বিকাশ করিত, একটি মনোহর পটবাসে যজ্ঞ-কর্ত্তার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। পুরোহিত এই সময়ে নানাবিধ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। সময়ে সময়ে যজ্ঞকর্ত্তা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা করিতেন। তিনি এই বক্তৃতা দ্বারা আপনার প্রাধান্য সাধারণকে জানাইতে ত্রুটি করিতেন না। এই যজ্ঞ-ভূমিই সে সময়ে প্রধান বক্তৃতা-স্থল

ছিল। যাহা হইক, পুরোহিতের ব্যবহারে কেহই সাহস করিয়া কোন কথা কহিত না। বস্তুতঃ সে সময়ে পুরোহিতেরা সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সকলেই পবিত্র মন্ত্রের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইত। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মন্ত্রবলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, আয়ু বৃদ্ধি পায়, সুখ-সৌভাগ্য অব্যাহত থাকে,এবং যুদ্ধে বিজয়-শ্রী লাভ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিত না। সুতরাং সমাজে ব্রাহ্মণের অসীম ক্ষমতা জন্মিল। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা-বলেই যেন ক্ষত্রিয়গণ নিরাপদে রাজ্য-শাসনে সমর্থ হন, বৈশ্য-গণ নিরাপদে কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য করিতে পারে, এবং দাসেরা নিরাপদে আর্য্য-সমাজে পরিগৃহীত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণেরা কেবল আপনাদের মন্ত্রের এইরূপ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন না, শাস্ত্রালোচনার সমস্ত অধিকারও আপনাদের হাতে রাখিলেন। তাঁহারা সাহিত্য, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেরই নিয়ন্তা ছিলেন। তাঁহাদের মুখ হইতে যাহা বাহির হইত, সকলেই তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত। ব্রাহ্মণেরা যেখানে যাহা কহিতেন, যে অবস্থায় যাহার ব্যবস্থা দিতেন,যে সময়ে যে শাস্ত্র রচনা করিতেন, তৎসমুদয়েই আপনাদের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এ সময়ে আর্য্যেরা সংশয়া-বিষ্ট, কৌতূহল-পর ও কুসংস্কার-যুক্ত ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বিচলিত হইল না। ব্রাহ্মণেরা অবাধে সকল বিষয়ে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞা-দিতে নরবলির ব্যবস্থা দিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। সামাজিক

বিপ্লব আরম্ভ হইল। এই বিপ্লবে এক জনও অসিহস্তে বাহির হইল না, এক বিন্দুও শোণিতপাত হইল না,একটিরও প্রাণ-বায়ুর অবসান হইল না; অথচ ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজ আলোড়িত হইয়া একটি নিরস্ত্র সম্প্রদায়ের পদানত হইল। ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা দিলেন, বাড়ীর পুরোহিত উপস্থিত না হইলে যজ্ঞাদিতে যে সমস্ত উপহার দেওয়া হয়, তৎসমুদয় দেবতারা গ্রহণ করেন না, সুতরাং দেবতাদিগকে সন্তৃপ্ত করিতে হইলে পুরোহিত নিযুক্ত করা আবশ্যক। পুরোহিত সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ। তাঁহার দেহের পাঁচ স্থানে পাঁচটি সংহারিণী শক্তি আছে। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারা রাজার রাজকীয় পদ, রাজ্য ও সাহস অক্ষুণ্ণ রাখেন, তদীয় প্রজার মঙ্গল বিধান করেন, এবং শেষে স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত করিয়া দেন। যদি কোন রূপে পুরোহিত অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার সংহারিণী শক্তি-পঞ্চকের বলে রাজা রাজকীয় পদ, রাজ্য ও সাহস হইতে বিচ্যুত হন এবং শেষে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক, পুরোহিতকে সন্তুষ্ট রাখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের এই ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় রাজগণ অবনত-মস্তক হইলেন। সামাজিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হইল। বিপ্লবের ফল সকল বিষয়ে দেশের মঙ্গল-জনক হইল না। সাহসী যোদ্ধারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইল, রাজারা ভ্রান্তি-জালে জড়িত হইলেন,জাতীয় জীবন ক্রমে ক্ষীণ-ভাব ধারণ করিল, এবং লোকের স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় সরলতা ও নিষ্ঠার প্রাধান্য রহিল না; কেবল কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সামান্য লোকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিল না, কোন নূতন বিষয়ে

আপনার ক্ষমতা দেখাইতে অগ্রসর হইল না, এবং কোন বিষয় আবিষ্কার করিতেও সমর্থ হইল না। সুতরাং হিন্দু আর্য্য-সমাজে উদারতা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সকল সম্প্রদায় মিলিয়া আপনাদের সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করা, একটি গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত হইল। ঐক্য ও সাম্যের আদর রহিল না। সকল স্থলেই অনৈক্য ও বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তা ও শাস্ত্র-প্রণয়নে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র অধিকার; শাস্ত্রের বিধান ভালই হউক বা মন্দই হউক, সকলেই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহা মানিতে লাগিল।

ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ক্ষমতা-বলে এইরূপ প্রাধান্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু চিরকাল অবিসম্বাদিত রূপে ইহার ফল ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অব্যবহিত পরেই ক্ষত্রিয়গণ অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণের ক্ষমতার আয়ত্ত রহিলেন না। ক্ষত্রিয় এখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লোপ করিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন। এত দিন তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের নিকট অবনত-মস্তক ছিলেন। কিন্তু সময়ে তাঁহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচিন্তা ও তপস্যায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা সাধনায় অটল, অধ্যবসায়ে অনলস ও সহিষ্ণুতায় অবিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাও অধিক দূরে ছিল না। সুসময় নিকটে আসিল, সুসময়ে ক্ষত্রিয় বিপুল উৎসাহের সহিত পবিত্র ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন।

কি কারণে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন, কি কারণে ব্রাহ্মণের ক্ষমতায় বাধা দিতে ক্ষত্রিয়ের প্রবৃত্তি জন্মিল, তাহার নির্দ্দেশ করা উচিত। যখন জাতিভেদ হয় নাই, যখন পুরোহিত ও যোদ্ধারা একত্র থাকিয়া এক উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল ছিলেন, তখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ উপ্ত হয়। যে কয়েক জন প্রধান ঋষি বৈদিক স্তোত্র রচনা করেন, জাতি-বিভাগ সময়ে তাঁহাদের বংশীয়গণই বোধ হয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের বংশ বৃদ্ধি পায়, এবং কাল-ক্রমে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণই আপনাদিগকে বৈদিক স্তোত্র-রচয়িতা ঋষিগণের সন্তান বলিয়া পরিচিত করিতে থাকেন। কিন্তু বিচক্ষণ রাজা ও যোদ্ধারাও সময়ে সময়ে বৈদিক স্তোত্র রচনা করিতেন। এই সকল রাজা ও যোদ্ধার সন্তানগণ ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ হন। যখন ব্রাহ্মণেরা আপনা-দিগকে সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত করেন, তখন ক্ষত্রি-য়েরা বিশেষ কোন আপত্তি করেন নাই। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যজ্ঞাদিতে পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন পুরোহিতের সন্তান—ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে প্রস্তুত হন। কিন্তু শেষে যখন ব্রাহ্মণেরা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন, যখন তাহারা সকল বিষয়েই আপনাদের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা দেখাইয়া সাধারণ্যে প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের বংশের লোক ব্যতীত আর কেহই পুরোহিত হইতে পারিবেন না, তখন ক্ষত্রিয়েরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণ যে, এক সময়ে পুরোহিতদিগের সহিত বৈদিক স্তোত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত

হয় নাই। এখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের এই অসীম প্রাধান্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে শ্বেত-পরিচ্ছদধারী; শ্বেত-শ্মশ্রু বর্ষীয়ান্ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলের প্রধান ছিলেন। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বশিষ্ঠের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বামিত্রের চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। সাধনা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা-বলে বিশ্বামিত্র ঋষির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি এখন ব্রাহ্মণের ন্যায় মন্ত্রবল অধিকার করিলেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী ও তপস্যা-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয়-রাজ বীতহব্যও এই-রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হন। এদিকে মিথিলার (ত্রিহুত) অধিপতি জনক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও একজন প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া, রাজর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার আশায় তাঁহার শিষ্য হইতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। এইরূপে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বৈদিক সময়ের শেষে ক্ষত্রিয়ের এই প্রাধান্য লাভ হয়। এই সময়কে বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পরবর্ত্তী উপনিষদের সময় বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা কর্ম্ম-কাণ্ডে যেমন আড়ম্বর করিয়া আসিতে ছিলেন, ক্ষত্রিয়েরা তেমনি পরমার্থ জ্ঞানে আপনাদের গভীরতা ও চিন্তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ অধিকার দেখিয়া ব্রাহ্মণের বিস্ময় জন্মিল। এ

দিকে ব্রাহ্মণেরা পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেও অস্ত্র-চালনা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহাঁরা অসি হস্তে করিয়া যুদ্ধ-স্থলে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ জমদগ্নির তনয় পরশুরাম অনেকবার মহাসংগ্রামে ক্ষত্রিয়-কুল বিনষ্ট করেন। কিন্তু এই পরশুরামকেও যুদ্ধ-বিদ্যায় ক্ষত্রকুল-তিলক রামচন্দ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে বৈদিক সময়ের শেষ অংশে ক্ষত্রিয়েরা সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণদিগকে পরাজিত করেন। ক্ষত্রিয়ের পর আর কোন জাতি এইরূপ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণের পুনর্ব্বার প্রাধান্য-লাভ।

খৃষ্টাব্দের এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু আর্য্যদিগের অবস্থা এইরূপ ছিল। ইহার পর ব্রাহ্মণেরা আবার প্রাধান্য লাভ করেন। উপনিষদের পরবর্ত্তী স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির সময়ে ব্রাহ্মণেরা অপ্রতিহত ভাবে আপনাদের ক্ষমতা চালনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের এই প্রধান্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎকর্ষের সময় পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারত।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ক্ষমতা-প্রিয়তা ও প্রভুত্ব-প্রযুক্ত যখন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হন, ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার জন্য যখন তাঁহারা স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব পরিগ্রহ করেন, তখন নিম্ন শ্রেণীর লোকের মন আলোড়িত হইয়া উঠে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা দেখিল, ব্রাহ্মণেরা যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বয়ং দেবতার অবতার

বলিয়া লোকের মনের উপর যে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘ কাল অবিচলিত থাকিল না। ব্রাহ্মণ-দিগের ক্ষমতা ও প্রাধান্য এখন তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ের হস্তগত হইল। ইহা দেখিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও সমাজে আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সামাজিক বিপ্লবের সময়ে সকলেই পরিশ্রমী ও কার্য্য-তৎপর হয়, সকলেই আপনাদের ক্ষমতা বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। সমস্ত আর্য্য-সমাজ যেন কোন অভিনব বলে বলীয়ান্ হইয়া জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এই জীবন্ত সময়ে অনেক প্রকার রচনা, অনেক প্রকার কার্য্য প্রণালী ও অনেক প্রকার রীতি নীতির প্রচার হয়। জগদ্বিখ্যাত কাব্য রামায়ণে, তৎপরে মহাভারতে এই সকল বিষয় একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

রামায়ণ বাল্মীকির এবং মহাভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সমগ্র রামায়ণ বাল্মীকির বা সমগ্র মহাভারত বেদব্যাসের রচিত বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রচনা একত্র হইয়া, এই দুই মহা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছে। রামায়ণের সময় ভারতবর্ষের সকল স্থানে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়ীয় নামক আদিম জাতির সংখ্যাই অধিক ছিল। কিন্তু রামায়ণের পর মহাভারতের সময় ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হয়। কান্য-কুব্জে দ্রুপদ-বংশীয়গণ, বিহারে জরাসন্ধ, মথুরার পশ্চিমে বর্ত্তমান জয়পুরের উত্তরে বিরাট, ভাগলপুরে কর্ণ, অগ্রে মথুরায়, পরে

দ্বারকায় যদুবংশীয়গণ এবং পূর্ব্ব পঞ্জাবে মদ্র প্রভৃতি মহারথ আর্য্যগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বিহারের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে হিন্দুদিগের আবাস ছিল।

রাম-রাবণের ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ।

রাম-রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের, এবং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান ঘটনা। অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথের তনয় রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় চৌদ্দ বৎসরের জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিত হইয়া রামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতার সহিত দক্ষিণাপথে যাইয়া, দণ্ডকারণ্যে বাস করেন। এই আরণ্য ভূমি লঙ্কার অধিপতি রাবণের অধিকৃত ছিল। এই স্থান হইতে রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে প্রায় সবংশে বধ করিয়া, ভার্য্যার উদ্ধার সাধন করেন। রামের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অনার্য্য জাতি। রামায়ণকার ইহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ যেমন আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে ঘটিয়াছিল, মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ তেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় নাই। দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি-প্রযুক্ত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে অসম্মত হওয়াতে এই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সুতরাং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আপন আপন আত্মীয়দিগের মধ্যে আত্ম-বিগ্রহ। সচরাচর আত্ম-বিগ্রহের পরিণাম যেমন বিষময় হইয়া উঠে, এ যুদ্ধের পরি-

ণামও তেমনি বিষময় হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়ী হইলেও রাজ্যভোগ করেন নাই। জ্ঞাতিগণের নিধনে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এজন্য তিনি অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য-ভার দিয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করেন।

মনুসংহিতা।

রামায়ণ ও মহাভারতের পর মনুসংহিতার নাম উল্লেখ করিতে হয়। হিন্দু আর্য্যদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ মনুসংহিতায় সবিস্তার বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টাব্দের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মনু কর্ত্তৃক এই সংহিতা সঙ্কলিত হয়। ক্ষত্রিয় বংশে মনুর উৎপত্তি। তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। মনু ক্ষত্রিয়-তনয় হইলেও অসঙ্কুচিত ভাবে সকল জাতির সম্বন্ধেই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের সাধারণ অবস্থা।

এই রামায়ণ,মহাভারত ও মনুসংহিতা হইতে বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তী কালের অবস্থা ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিবরণ জানিতে পারা যায়। এই সময়ে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে আর্য্যেরা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্য-ভূমি নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কেহই কোন সময়ে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য থাকাতে একটি সুবিধা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, বৃহৎ রাজ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্যে সভ্যতার ও সুনিয়মের শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ হয়। সুতরাং সভ্যতার প্রথম অবস্থায় বৃহৎ ভূখণ্ডে খণ্ড রাজ্য থাকা ভাল। উপস্থিত সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে

এইরূপ খণ্ড রাজ্য সকল থাকাতে আর্য্য-সভ্যতা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

রাজারা প্রাচীর-বেষ্টিত রাজধানীতে থাকিয়া যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতেন। প্রজাপালন, কর-সংগ্রহ ও দেশ-রক্ষা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন গুরুতর কার্য্য ছিল না। তাঁহারা সময়ে সময়ে মৃগয়ায় যাইতেন। তাঁহাদের অনেকে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। প্রজারা সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। রাস্তা ঘাট সকল পরিচ্ছন্ন ছিল। নগরের রাস্তায় জল দিবার জন্য লোক সকল নিয়োজিত থাকিত। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। শূদ্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল। অসবর্ণ বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণীর কন্যা ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা গ্রহণ করিতেন, ক্ষত্রিয় এইরূপ স্বশ্রেণীর কন্যা ভিন্ন, বৈশ্য ও শূদ্রের, এবং বৈশ্য স্বশ্রেণীর ভিন্ন শূদ্রের কন্যা পরিগ্রহ করিত। শূদ্রেরা কেবল স্বজাতীয়া কন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইত। এই অসবর্ণ বিবাহে যে সকল লোকের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া উঠে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বাণিজ্য ও বিলাস-দ্রব্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষি-কার্য্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বর্ণ-খচিত শাল ও বন্য বিড়াল প্রভৃতির কোমল চর্ম্ম, গুজরাটে কম্বল, কর্ণাট ও মহীসূরে মসলিন, বাঙ্গালায় হাতীর গদির চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এতদ্ব্যতীত চীন প্রভৃতি দেশ হইতে পশমী ও রেশমী কাপড় আসিত। রাজসূয় যজ্ঞে মহা-

রাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য এই সকল দেশের রাজারা আপন আপন দেশের দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষেত্রের চারি দিকে খাল থাকিত, কৃষিজীবীরা এই খালের জল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেচন করিত।

অনার্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তি।

এই সময়ে অনার্য্যদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। পূর্ব্বে শূদ্রেরা কেবল দাসত্বে নিযুক্ত থাকিত। কৃষি-ক্ষেত্রের ও বাড়ীর অপরিষ্কার কাজ ব্যতীত ইহাদের উপর আর কোন গুরুতর বিষয়ের ভার সমর্পিত হইত না। কিন্তু সময়ে এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়। সময়ে শূদ্রেরা আর্য্যদের সহিত মিশিয়া আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে অনার্য্যদিগের উৎকর্ষের অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সময় পর্য্যন্ত অনার্য্যেরা আপনাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল বিমোচন ও আচার-ব্যবহারে আপনাদিগকে আর্য্যদিগের সহিত এক শ্রেণীতে স্থাপনের জন্য, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা করে। এই সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস কেবল অনার্য্যদিগের এই অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার বিবরণে পূর্ণ রহিয়াছে। অনার্য্যদিগের এই চেষ্টা বিফল হয় নাই। তাহারা সরলতা ও সৎকার্য্যে আর্য্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। অনেকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; অনেকে কৃষি-কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। শেষে শূদ্রগণ "বৃষল" অর্থাৎ কৃষক নামে অভিহিত হয়। কালে এই বৃষলগণ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

তিন উপায়ে অনার্য্যদিগের এইরূপ উৎকর্ষ হয়। প্রথম অসবর্ণ বিবাহ, দ্বিতীয় আর্য্য-সমাজের সহিত সংমিশ্রণ, তৃতীয় আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির অনুকরণ। যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদিগকে পরাজিত করেন, তখন তাঁহারা সাহসে দৃপ্ত, গৌরবে উন্নত, এবং কার্য্যকারিতায় অবিচলিত ছিলেন। তখন তাঁহারা বিজিতদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন। বিজিতেরা তখন যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না, যজ্ঞীয় দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিত না, এবং কোন বিষয়ে আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে সাহসী হইত না। বিজিতগণ এইরূপে বিজেতাদের ঘৃণার পাত্র হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। তাহাদের এই সুসময় অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। প্রায়ই দেখা যায়, বিজেতারা দেশ-বিজয়, প্রাধান্য স্থাপন, ও আত্ম-মহত্ত্ব প্রচারের পর যখন বিশ্রামের জন্য লালায়িত হন, বিলাসিতা ও সৌখীনতার তরঙ্গ আসিয়া, যখন তাঁহাদিগকে আন্দোলিত করে, তখন বিজিতগণ ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে থাকে। এ সময়ে হিন্দু আর্য্য-সমাজ ঠিক এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। এখন আর্য্যেরা অনেক অংশে নিরুপদ্রব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ মস্তক অবনত করিয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা এখন আত্ম-সুখ-বর্দ্ধনের চেষ্টায় ছিলেন। এদিকে, অনার্য্যেরা নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাহারা এই সময়ে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের এ চেষ্টা বিফল হইল না। দীর্ঘকাল একত্র অবস্থানে জেতৃ-বিজিত সম্বন্ধ ক্রমে শিথিল হইয়া

উৎকর্ষ-প্রাপ্তির তিন উপায়।

পড়িয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ যে, এক সময়ে অনার্য্যদিগের প্রতি কঠোরতা দেখাইয়াছিলেন, তদীয় সন্তানগণের স্মৃতি হইতে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। আর্য্যেরা এখন আর অনার্য্যদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। অনার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করা এখন আর তাঁহাদের নিকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল না। মহাভারতে দেখা যায়, ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস অনার্য্যা নারী সত্যবতীর পুত্র। শান্তনু সত্যবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। পাণ্ডব ও কৌরব-দিগের সম্মানিত বিদুর দাসী-পুত্র। আর্য্যেরা এইরূপে অনা-র্য্যদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পরাঙ্‌মুখ হইতেন না। এই অস-বর্ণ-পরিণয়ে অনার্য্যেরা ক্রমে আর্য্য-সমাজে উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

ইহার পর অনার্য্যেরা ক্রমে আর্য্যদিগের সহিত মিশিয়া যায়। প্রথমে ইহারা আর্য্য-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত। শেষে ইহাদিগকে আর্য্যদিগের গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ক্রমে অনার্য্যগণ আর্য্য-সমাজ-ভুক্ত হইয়া যথানিয়মে যজ্ঞাদি করিবারও ক্ষমতা পায়। আর্য্যদিগের সহিত এই সংমিশ্রণ অনার্য্যদিগের উৎকর্ষের দ্বিতীয় উপায়। এইরূপে আর্য্য-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া, অনার্য্যেরা অতঃপর আর্য্যদিগের আচার ব্যব-হার ও রীতি নীতির অনুকরণ করিতে থাকে। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্যেরা অনার্য্যদের সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহাদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় অবজ্ঞা করিতেন না। অনার্য্যে-

রাও আর্য্যদের সহিত মিশিয়া আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে চেষ্টা পাইত। রামায়ণের রামচন্দ্র দক্ষিণাপথের অনার্য্যদিগের সহিত মিত্রতা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। এই অনার্য্যগণ যদিও রামায়ণে বানর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি ইহারা অনেক বিষয়ে আর্য্যদিগের ন্যায় বীরত্ব ও বহুদর্শিত্ব দেখাইয়াছে। এদিকে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসগণও অনার্য্য জাতি। রামায়ণের রাক্ষসগণ হিংস্র, ভয়ানক ও বেদানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও রাক্ষস-রাজ রাবণের পুরী সংস্কৃতভাষী আর্য্য-রাজগণের রাজধানীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। লঙ্কার সকলেই যেন আর্য্যজাতির ব্যবহার ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী। ইহাতে দেখা যাইতেছে, রামায়ণের সময় অনার্য্যদিগের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না। আর্য্যেরা যেমন অনার্য্যদিগের সহিত মিশিতেন, অনার্য্যেরাও তেমনি আর্য্যদের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে একজন দস্যুরাজার বিবরণ আছে। এই দস্যুরাজ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী; ইঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারের এই অনুকরণ অনার্য্যদিগের উৎকর্ষের তৃতীয় ও শেষ উপায়।

আর্য্যেরাও শূদ্রদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তির উপায় বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে হিন্দু আর্য্য-সমাজে উদারতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই উদারতা-গুণে হিন্দু আর্য্য-সমাজ সচ্চরিত্র, সদাশয় ও সৎকর্ম্মশীল শূদ্রকেও আপনাদের শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন। বস্তুতঃ সাধুতার উপর আর্য্যদিগের

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুতা হইতে স্খলিত হইলে শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইতেন; শূদ্র সাধুতা দেখাইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। মনু কহিয়াছেন, "শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সন্তানের সম্বন্ধেও এই প্রকার জানিবে।" প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, "শূদ্র শুভ কর্ম্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে শূদ্র-সন্তান, জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়। উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্র দ্বারা সকলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া থাকে।" উদার-হৃদয়, বিশুদ্ধমতি হিন্দু আর্য্যগণ উদারতা ও বিশুদ্ধতার দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। লোমহর্ষণ সূতজাতীয় হইয়াও প্রাচীন হিন্দু আর্য্য-সমাজের ঋষিদিগের সাতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ইঁহার পুত্র সৌতিকে মহাভারত-বক্তার পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

আচার-ব্যবহার।

এ সময়ে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বিচলিত হয় নাই। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ আইন প্রণয়ন ও নিয়ম ব্যবস্থাপন করিতেন। তাঁহারা সন্ধি-বিগ্রহের মন্ত্রণা-দাতা ছিলেন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের

পরামর্শ-দাতা ছিলেন, এবং সমুদয় সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলেও আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সভ্যতা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করে, এবং তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। অসীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ ঋষিরা বিষয়-নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁহারা লোকালয়ের নিকটে সামান্য পত্রকুটীরে বাস করিতেন, এবং পরান্ন-ভোজী হইয়া কেবল শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্র-প্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ বিষয়-নিস্পৃহ ও এইরূপ স্বার্থত্যাগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এক সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে চারি দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য-রক্ষার ভার, ক্ষত্রিয়ের উপর সমর্পিত ছিল। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিতেন। পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে, বৈশ্যেরা লিপ্ত ছিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ইহাদিগকে বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত রাখিতে হইত। শূদ্রদের অবস্থা যে উন্নত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহারা এখন শিল্প ও কৃষিকার্য্য করিত।

রাজারা আত্ম-প্রাধান্য দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। এই মহাযজ্ঞে সকলকেই যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া এই মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত

করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির ইহাঁদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই আদর-সহকারে পরিগৃহীত হন। বস্তুতঃ এই মহাযজ্ঞে আড়ম্বরের একশেষ হইয়াছিল।

আর্য্যগণ এ সময়ে আহার-পানে বিশেষ আসক্ত ছিলেন। এখন যেমন ইউরোপীয়গণ আহার-পানের সময় বক্তৃতা, এবং গান, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি আমোদকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করেন, আর্য্যগণও তেমনি মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া সুপেয় সুরা পান ও সুখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতেন। এই সময়ে অনেক প্রকার আমোদ হইত। সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস-প্রিয়তার বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। মহাভারতে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক তীর্থে একদা এইরূপ আমোদের অনুষ্ঠান করেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, বলদেব ও দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মহামান্য আর্য্যগণ এই প্রমোদ-ভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। বলদেব রেবতীর সহিত, কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত, এবং অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত নৃত্য করেন। অপ্সরাগণ ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। যাদবেরা এই সকল অপ্সরার সঙ্গে নৃত্যগীত ও পান ভোজনাদি করিয়া আমোদিত হন। স্থানে স্থানে নাটকবিশেষের অভিনয় হইত। নারীদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবার জন্য, প্রত্যেক ভদ্রপরিবারে শিক্ষক থাকিতেন। এ সময়ে নালিক, শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। যুদ্ধে কেবলী ধনুর্ব্বাণ বা পরশু, শূল প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত না।

হিন্দু আর্য্যদিগের রাজনীতি উচ্চ অঙ্গের ছিল। রাজনীতির এই উপদেশ ছিল যে, রাজারা ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইবেন না, রাজকার্য্যে আলস্য করিবেন না, এবং ক্রোধের বশীভূত থাকিবেন না; দেশকালাভিজ্ঞ, সাহসী, নির্লোভী, জ্ঞানী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে দূত পদে নিযুক্ত করিয়া ভিন্ন দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; আত্মানুরূপ, বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রীগণের মন্ত্রণায় তাচ্ছীল্য দেখাইবেন না; আবশ্যক হইলে কৃষকদিগকে অল্প সুদে প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ ঋণ দিবেন; গূঢ় মন্ত্রণা সকল জনপদমধ্যে প্রচার করিবেন না; স্বল্পায়াস-সাধ্য, মহোদয় কার্য্য সকল শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবেন; কোন বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণদ্বারা সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন; দুর্গ সকল ধন, ধান্য ও জলাশয়ে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবেন; শিল্পীগণ ও সৈনিক পুরুষ সকল সর্ব্বদা সাবধানে তথায় অবস্থান করিবে। রাজা কঠোর দণ্ড-বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবেন না; যথাসময়ে সৈন্যদিগকে বেতন দিবেন, যেহেতু যথাসময়ে বেতন না দিলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এবং পদে পদে বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে; সৎকুল-জাত প্রধান প্রধান লোককে আপনার অনুরক্ত রাখিবেন; যে সকল লোক রাজার উপকারের জন্য কালগ্রাসে পতিত, বা যারপরনাই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের পুত্র, কলত্র প্রভৃতির ভরণ পোষণ করিবেন; শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া, আপনার বলাবল পরীক্ষা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিবেন; যুদ্ধ-যাত্রার সময় সৈন্যদিগকে

হিন্দুদিগের রাজনীতি।

অগ্রিম বেতন দিবেন; বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ-কালে আপনার অধিকার সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন; পরাজিত শত্রুদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; পিতা মাতা যেমন আপনার সকল সন্তানকে সমান ভাবে স্নেহ করেন, তিনিও তেমনি পৃথিবীর সকলের প্রতি সমান স্নেহ দেখাইবেন; আয় ব্যয়ের গণনায় নিযুক্ত লেখকগণ রাজার আয় ব্যয় পূর্ব্বাহ্নে নিরূপণ করিয়া রাখিবে। রাজা রাজ্যস্থ কৃষকদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবেন; রাজ্যের স্থানে স্থানে সলিল-পূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল নিখাত করিবেন,যেন কৃষকগণ সর্ব্বদা বৃষ্টির অপেক্ষায় না থাকে। দুর্ব্বল শত্রুকে বল প্রকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যথা-কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশ-ভূষা করিয়া, মন্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাদিগকে দর্শন দিবেন; দুষ্ট, অহিতকারী, দণ্ডার্হ তস্করদিগকে ক্ষমা করিবেন না। এগুলি যে উৎকৃষ্ট রাজনীতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু আর্য্যগণের রাজনীতির অনেক বিষয় বর্ত্তমান সময়ের রাজগণেরও অনুকরণীয়।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-নীতি।

রাজনীতির ন্যায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মনীতিও উচ্চ ভাবে পূর্ণ ছিল। আর্য্যেরা অহিংসা, সত্য বচন, সর্ব্বজীবে দয়া, শম ও যথাশক্তি দান, এই কয়েকটি গৃহস্থদের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের মতে এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং পরদার-বিরতি, গৃহীত স্ত্রীর পরিরক্ষণ, অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণে বিরতি, ও মদ্য মাংস পরিত্যাগ, এই পাঁচটি প্রধান ধর্ম্ম-নীতি-সম্মত কার্য্য ছিল। এই পঞ্চ ধর্ম্ম বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুরা

সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া এই বহুশাখাযুক্ত ধর্ম্ম-নীতির সম্মান রক্ষা করিতেন।

হিন্দু আর্য্যদিগের এই ধর্ম্ম-নীতি, সকল বিষয়েই উন্নত অবস্থার পরিচয় দিতেছে। আর্য্যেরা সন্তোষ ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে, সাধুতা ও মহত্ত্বের সম্বন্ধে, তেজ ও ক্ষমার সম্বন্ধে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সম্বন্ধে এবং নারী-ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নীতি সকল নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নীতির উপদেশ এই, উপস্থিত সুখ দুঃখ সমভাবে বহন করিবে, যাহার মন পরিতুষ্ট, সকলই তাহার নিকট সম্পত্তীভূত হয়। যে পরিমাণে কেহ উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করিবে। যাহাদের অন্ন ভোজন ও যাহাদের আলয়ে বাস করিতে হয়, কখনও তাহাদের অনিষ্ট করিবে না। নিয়তই উদ্যত থাকিবে, কোনও ক্রমে অবনত হইবে না। সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা-বলে বশীভূত করিবে, ক্ষমাপর ব্যক্তিরা ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে শ্রেয় লাভ করেন। কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। পুরুষ অশক্ত বলিয়া কখনও আপনার অবমাননা করিবে না, যেহেতু আত্মাবমানী ব্যক্তি কখনও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না। ইহার পর নারী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, স্ত্রী সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিবে, গৃহ-কর্ম্মে দক্ষ হইবে, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত রাখিবে, ব্যয় বিষয়ে অমুক্ত-হস্ত হইবে, পরিজনবর্গকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং সকলকে ভোজন করাইয়া শেষায় আপনি ভোজন করিবে। আচার ব্যবহার ও অতিথি-সৎকার প্রভৃতির সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের বিশেষ উদারতা

ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ এই, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও ভৃত্যবর্গ, ইহাদের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র আপনার শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ ছায়ার স্বরূপ, আর দুহিতা পরম কৃপার পাত্রী। পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে, এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। যেখানে স্ত্রীলোকেরা আদৃতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, যেখানে নারীদিগের অনাদর,সেখানে সকল সৎকার্য্য নিষ্ফল হয়। ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে যে ধন লাভ হয়, তাহাকেই যথার্থ ধন বলে। কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না, অতিথি-সেবা দ্বারা ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা কহিয়াছেন, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ, মূত্রাদি ত্যাগ, পাদ-প্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিক্ষেপ, এগুলি আবাস-গৃহ হইতে দূরে করিবে। জলে মূত্র, বিষ্ঠা বা থুথু ফেলিবে না, মলমূত্রাদি-দূষিত বস্ত্র ক্ষালন করিবে না, কিংবা রক্ত বা কোন প্রকারে বিষ নিক্ষেপ করিবে না। দেহ রক্ষার জন্য পরিষ্কার জল বড় প্রয়োজনীয়। পানীয় জল অবিশুদ্ধ হইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। হিন্দু আর্য্যগণ ইহা জানিতেন, এই জন্য তাঁহারা পানীয় জল পবিত্র রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপরের গলগ্রহ হওয়া, অধিক কি কোন উপাদেয় দ্রব্য পরিজন-বর্গকে না দিয়া একাকী ভোজন করাও হিন্দু আর্য্যেরা ঘোরতর পাপের মধ্যে গণনা করিতেন। একদা কোন মুনি আপনার মৃণালগুলি কোন এক ঘাটে রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন,

স্নানের পর উঠিয়া দেখিলেন, সমুদয় মৃণাল অপহৃত হইয়াছে। তখন সেই ঋষি সমভিব্যাহারী ঋষিদিগকে মৃণালের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ঋষিগণ কঠিন শপথ করিয়া আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন বলিলেন, যে আপনার মৃণাল লইয়াছে, সে ভার্য্যার উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করুক, শ্বশুরের অন্ন খাইয়া জীবিত থাকুক। আর এক জন কহিলেন, যে আপনার মৃণাল লইয়াছে, সে উপাদেয় দ্রব্য একাকী ভোজন করুক। প্রাচীন হিন্দুগণ এইরূপ সরল ও উদার ছিলেন। এইরূপ সরলতা ও উদারতা তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। বোধ হয়, কোন দেশের কোন সভ্য জাতি ধর্ম্মনীতির উচ্চতায় প্রাচীন হিন্দুদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা।

হিন্দু মহিলারা আদর ও সম্মানের পাত্রী ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বিশ্বস্তা কিঙ্করীরও কোনরূপ অসম্মান করিতেন না। যুধিষ্ঠির আপনার কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরস্পরের প্রতি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় অগ্রে স্ত্রীলোকের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইত। ভরত বন-প্রবাসী রামচন্দ্রের নিকটে গেলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাক ত?" ধৃতরাষ্ট্রও এইরূপ এক সময়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "রাজ্যের দুঃখিনী অঙ্গনারা ত উত্তম রূপে রক্ষিত হইতেছে? রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ত সম্মান প্রদর্শিত হয়?" যে স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ, কি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারীর বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করিত,

তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। এই সময়ে স্ত্রীলোকেরা গৃহ-পিঞ্জরে নিরুদ্ধা থাকিতেন না। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞপ্রভৃতি উৎসব-স্থলে উপস্থিত হইতেন। যুদ্ধের সময়ও স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। বিবাহে কন্যার সম্মতি-গ্রহণ আবশ্যক হইত। মৃত-ভর্ত্তৃকারা পূর্ব্বের ন্যায় পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। পরলোকে হিন্দুদিগের অটল বিশ্বাস ছিল। পার্থিব জীবনের পর লোকান্তরে আত্মীয় স্বজনের সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে, হিন্দুরা ইহা বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস-প্রযুক্ত সহমরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সামান্য ভোগ-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদেবময় পতির অনুগমন করিলে লোকান্তরে সুখে তাঁহার সহিত বাস করিতে পারিব, ইহা মনে করিয়া সতী ভর্ত্তার চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু মনুসংহিতায় সহমরণের ব্যবস্থা নাই। মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর অনুমৃতা বা পুনর্ব্বার বিবাহ-পাশে আবদ্ধা না হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

যাহা হউক, হিন্দুমহিলাগণ যথানিয়মে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহারা অশ্বচালনায় তৎপরা ছিলেন। কেহ কেহ যত্ন পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগ অভ্যাস করিতেন। দ্রৌপদী আলেখ্য-রচনা ও শিল্পকার্য্য শিক্ষার পর আচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গৃহ-কার্য্যে হিন্দু নারীর অমনোযোগ ছিল না। ইঁহারা মিত ব্যয় ও মিতাচার অভ্যাস করিতেন। ইঁহাদিগকে আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য, নির্ব্বাহ করিতে হইত। ইঁহারা গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন ও পাক প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষা হইতেন। মহাভারতে লিখিত আছে, পতিপ্রাণা দ্রৌপদী এক

সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন, "আমি অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি, প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ-পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজ্য সামগ্রী-দান, ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। কখনও দুষ্টা স্ত্রীর সহিত সহবাস করি না, তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না। সকলের প্রতি অনুকূলতা দেখাই, আলস্য-শূন্য হইয়া কাল যাপন করি। কখন অতিহাস্য ও অপরিষ্কার স্থানে বাস করি না, এবং কখনও অতিক্রোধের বশীভূত হই না।" হিন্দু মহিলারা যে, সুগৃহিণীর ধর্ম্ম অবগত ছিলেন, তাহা মহাভারতের এই বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে।

হিন্দুমহিলাগণ আদর ও সম্মানের পাত্রী হইয়া যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা ও সুগৃহিণীর ধর্ম্ম অভ্যাস করিলেও সকল বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেন না। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপ-স্রোতও প্রবাহিত হইয়া থাকে। যখন বিলাসিতা ও সৌখী-নতার আবির্ভাব হয়, সাধারণে যখন ভোগ-সুখের জন্য লালা-য়িত হইয়া উঠে, তখন সময়ে সময়ে সুনীতি ও ধর্ম্মের অবমাননা এবং তৎপ্রযুক্ত অনিষ্টাপাত অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এই অনিষ্টাপাতের আশঙ্কায় মনু স্ত্রীজাতিকে স্বাতন্ত্র্যে বঞ্চিত করিয়া-ছেন। মনুর মতে বালিকাই হউক, যুবতীই হউক, আর বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীলোক কোন সময়ে কোন কর্ম্মেই আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক এই তিন অবস্থায় যথাক্রমে পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। হিন্দুমহিলারা এইরূপ অন্যপরতন্ত্রা হইয়া থাকিলেও আত্মোৎকর্ষ-বিধানে উদাসীন ছিলেন না।

জাতিবৃদ্ধির সহিত এ সময়ে দেবতার সংখ্যাও বৃদ্ধি

হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী।

পাইয়াছিল। লোকে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনা করিত। উপাসক এই সকল দেবতার মধ্যে যাঁহার স্তব করিতেন,তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞ, অমর, অনন্ত ও অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তাঁহার প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। উপাসনা-সময়ে এই উপাস্য দেবতা ভিন্ন আর কেহই উপাসকের মনোমধ্যে উদিত হইতেন না। সুতরাং বহু দেবতা থাকিলেও আর্য্যেরা যখন যাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহাকেই স্বর্গীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও অসীম ক্ষমতাপন্ন ঈশ্বর স্বরূপ মনে করিতেন। এইরূপে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের প্রাধান্য কল্পিত হইত। সর্ব্বজীবের প্রভু প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে এইরূপ স্তোত্র আছেঃ—

"যিনি শ্বাস দান করেন, যিনি বল দান করেন, উজ্জ্বল দেবতারা যাঁহার আদেশ পালন করেন, * * * সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?

"যিনি আপনার মহিমাবলে জাগ্রত ও নিদ্রিত, সমস্ত জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, যিনি মনুষ্য ও পশু, সকলকেই শাসন করিয়া থাকেন, সেই দেবতা কে? যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?

"যাঁহার মহিমাবলে আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে, পৃথিবী দৃঢ়তর হইয়াছে, যাঁহার মহিমায় স্বর্গ স্থাপিত রহিয়াছে, যিনি আকাশের পরিমাণ করিয়াছেন, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?

"যাঁহার মহিমাবলে তুষারাবৃত পর্ব্বতগণ বিদ্যমান রহি-

য়াছে, সমুদ্রসরিৎ যাহার ক্ষমতায় অবস্থিতি করিতেছে, এই সমস্ত প্রদেশ যাঁহার দুই বাহু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেই দেবতা কে, যাঁহাকে আমরা উপহার প্রদান করিব ?"

এই স্তোত্রে প্রজাপতির প্রাধান্য ও অসীম ক্ষমতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতারাও এইরূপ উচ্চতর ভাবে স্তুত হইতেন। কিন্তু পুরাণ-প্রোক্ত বহুসংখ্য দেবতার কল্পনা এ সময়ে হয় নাই। এখনকার শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির উপাসনা-পদ্ধতি অপ্রচারিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য পাওয়াতে যাগযজ্ঞের ঘটার বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার উপলক্ষে নানারূপ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইত। দোষক্ষালনের জন্য লোকে নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিত। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ এ সময়ে সর্ব্বমান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ যাগযজ্ঞের বর্ণনা আছে। এই ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। আর্য্যেরা ব্রাহ্মণভাগের নিয়মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে আরণ্যকের বিবরণ আছে। বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপে আত্ম-সংযম ও ঈশ্বর-চিন্তা করিতে হয়, ইহাতে তাহার বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অরণ্যবাসী আর্য্যদিগের অবলম্বনীয়, এ জন্য ইহা আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। আরণ্যকের শেষে বা উহার সঙ্গে "উপনিষদ" দৃষ্ট হয়। উপনিষদের প্রকৃত অর্থ গুরুসমীপে ছাত্রের সমাগম। যে জ্ঞানবলে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বনিয়ন্তা, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা জানিতে পারা যায়, উপনিষদে সেই জ্ঞানের বিবরণ আছে। সুতরাং অনন্ত,

অদ্বিতীয় ঈশ্বরসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্যেরা গৃহে থাকিয়া যথানিয়মে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, পরে জীবনের শেষ অবস্থায় অরণ্যে যাইয়া আরণ্যক ও উপনিষদের সাহায্যে জগৎ-পাতা জগদীশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট হইতেন।

চারি আশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, এই চারি আশ্রম প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল। এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণকে চারিটি, ক্ষত্রিয়কে তিনটি, বৈশ্যকে দুইটি, ও শূদ্রকে ঐ চারিটির কোন একটি যথাবিধি প্রতিপালন করিতে হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপে আপনাদের পবিত্রতাময় সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতেন, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, সমাজের উপকারের জন্য আপনাদের জীবন কিরূপ কঠোর ব্রতময় করিয়া তুলিতেন, এবং আপনাদের ধর্ম্মে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা এই চারি আশ্রমের বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য সকল আশ্রমের আদি। মানবের ধর্ম্মমন্দিরে আরোহণের প্রথম সোপান ব্রহ্মচর্য্য। বীজ, উপযুক্ত রস ও তাপের সাহায্যে যেমন ফল-ধারণক্ষম বৃক্ষের আকারে পরিণত হয়, হিন্দুবালক তেমনি ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকারী আর্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বাল্য-কালে হৃদয়ে যে ভাব প্রবেশ করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। শৈশবের জ্ঞান, শৈশবের শিক্ষা,

শৈশবের ধারণা চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। প্রস্তরে খোদিত রেখা যেমন সহজে বিলুপ্ত হয় না, শিশুকালের শিক্ষাও তেমনি সহজে হৃদয় হইতে দূরে যায় না। এই জন্য হিন্দু আর্য্যভূমিতে বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিপালনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যাহাতে পরম ধার্ম্মিক উপযুক্ত গৃহস্থ হওয়া যায়, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রধানতঃ তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দু আর্য্যসন্তানের পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গৃহ হইতে গুরু-সন্নিধানে গমন করিতে হয়। একটি বা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বেদের নাম ব্রাহ্মণ হওয়াতে তিনি ব্রহ্মচারী অথবা বেদশিষ্য বলিয়া উক্ত হন। শিক্ষালাভ করিতে ন্যূনকল্পে বার বৎসর ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় আট-চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইত। গুরু-গৃহে বাসকালে কোমল-মতি, তরুণবয়স্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অধীন হইয়া চলিতে হইত। তিনি প্রতিদিন দুই বার, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে সন্ধ্যা করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তিনি এই ভিক্ষালব্ধ সমস্ত সামগ্রীই গুরুর হাতে দিবেন। গুরু যাহা খাইতে দেন, তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পাইবেন না। তাঁহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ, হোম-স্থান পরিষ্কারকরণ ও দিবারাত্রি গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইবে। এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে গুরু তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিবেন। এই বেদ যাহাতে কণ্ঠস্থ হয়, এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে

পারেন, গুরু তাঁহাকে তদ্বিষয়ের উপযোগী শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিবেন না। ব্রহ্মচারী বালককে মিতাহারী ও মিতাচারী হইয়া অতি কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অনেকগুলি নিয়ম আছে। ব্রহ্মচারী গুরু-কুলে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয় সংযম করিবেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও প্রাণী-হিংসা পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি ভিক্ষা-লব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাকে দ্যূত-ক্রীড়া, পর-নিন্দা, স্ত্রী-সেবা, ও পরের অপকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আচার্য্যের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া দিবেন, প্রতিদিন স্নান করিবেন, শুচি হইয়া, দেব, ঋষি, পিতৃ-লোকের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবেন, এবং যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া হোম করিবেন। এইরূপ কষ্টসহিষ্ণু, এইরূপ আত্মসংযত ও এইরূপ ভোগবিলাস-পরিশূন্য হইয়া, তরুণবয়স্ক ব্রহ্মচারী দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন। দশপ্রকার ধর্ম্ম-লক্ষণ এই,—ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ। হিন্দু আর্য্যের পবিত্র ভূমিতে, পবিত্র স্বভাবশিক্ষার্থী, গভীর ধর্ম্ম-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে, সমুদয় ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিয়া, এই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন।

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁহারা দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া, যথানিয়মে দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা পূর্ব্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, গৃহস্থ হইতেন, তাঁহাদের নাম উপকুর্ব্বাণ, আর যাঁহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া, বিষয়ভোগে

নিস্পৃহ হইয়া কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ঈশ্বরের চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া উক্ত হইতেন।

বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন। শরীর রুগ্ন হইলে কোনও কার্য্যে মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না। এই জন্য প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রহ্মচারী প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন, স্নান করিয়া শুচি হইয়া, যজ্ঞকাষ্ঠ আনিতেন, হোম-স্থান পরিষ্কার করিতেন, এবং যথানিয়মে গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে তাঁহার শরীর দৃঢ় ও সবল হইত। সে সময়ে শিক্ষার্থীর বিলাসিতা ছিল না। গাড়ীতে বা পাল্কীতে চড়িয়া, তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে আসিতেন না। সৌখীনতা পরিহার করিয়া, পার্থিব বিষয়-লালসা হইতে দূরে থাকিয়া, তিনি শারীরিক পরিশ্রমের বলে সমুদয় কার্য্য করিতেন। সুতরাং জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার দৈহিক বলের বিকাশ হইত, স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকিত। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থীর যে যে গুণ থাকা উচিত, ব্রহ্মচারী তৎ-সমুদয়ে বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত হইতে থাকিতেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতেন, ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকি-তেন, চিত্তসংযমে পারদর্শী হইতেন, এবং নিষ্ঠাবান্ হইয়া দেবারাধনা, অধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রহ্মচারী পঞ্চম বা অষ্টমবর্ষ হইতেই অনেক ভার ঠেলিয়া উঠিয়া, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া, চিত্তসংযম অভ্যাস করিতেন। তাঁহার জীবন

কঠোর তপস্যাময় ছিল। তিনি এই তপস্যার বলে পরে গৃহস্থ হইয়া সংযতভাবে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, এই তপস্যার বলে পবিত্র মানব নামের যোগ্য হইয়া উঠিতেন, এবং এই তপস্যার বলে কি বিষয়-ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্ম-রাজ্যে, সর্ব্বত্রই সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অদ্বিতীয় পাত্র হইতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, আয়োদধৌম্য নামক এক জন শিক্ষা-গুরুর উপমন্যু নামে এক জন শিষ্য ছিল। উপমন্যু ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। গুরু শিষ্যের কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য উপমন্যুকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। উপমন্যু গুরুর আদেশে কিছু মাত্র দুঃখিত হইলেন না, পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া, বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু ইহা শুনিয়া, তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতেও নিষেধ করিলেন। উপমন্যু, দুগ্ধপান-সময়ে বৎসের মুখ দিয়া যে ফেণ বাহির হইত, তাহাই খাইয়া গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। গুরু অতঃপর তাঁহাকে উহা খাইতেও বারণ করিলেন। উপমন্যু তখন বৃক্ষপত্র খাইয়া ভক্তিভাবে গুরুর পরিচর্য্যা ও সংযতচিত্তে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতার কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত! কঠোর ব্রতাচরণের কি জলন্ত উদাহরণ! এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বরণীয় দেবতার ধ্যান করিতে করিতে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ সংসার-ক্ষেত্রে থাকিয়া লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইতেন, এবং এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ সমুদয় মলিনতা, সমুদয় পঙ্কিলভাব ও

সমুদয় সাংসারিক প্রলোভন পরিহার করিতেন। যাঁহার হৃদয় এই শিক্ষায় বলীয়ান্ হইত, তিনিই প্রকৃত আর্য্য, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, এবং তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন।

গার্হস্থ্য।

দ্বিতীয় আশ্রম, গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচারী যথা-নিয়মে বিবাহ করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে গৃহস্থ বা গৃহমেধী বলিয়া উক্ত হন। গৃহস্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া নিষ্ঠাবান্, আত্মসংযত, বিলাস-বিদ্বেষী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন। সুতরাং সংসার তাঁহার নিকট চিরপবিত্রতাময় ধর্ম্মাচরণের অপূর্ব্ব ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এ সময়ে তিনি বৈদিক স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীত হইয়াছে। এই পবিত্র গ্রন্থের নিয়মানুসারে তিনি সমুদয় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কোন কোন আরণ্যক ও উপনিষদও অভ্যাস করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দ্বিতীয় আশ্রম তাঁহাকে ধীরে ধীরে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি ব্রত প্রতিপালন করিতেন ঃ—

(১) বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন।

(২) শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ।

(৩) আরাধনাদি দ্বারা দেবলোকের তর্পণ।

(৪) জীবের আহার দান।

(৫) অতিথি-সৎকার।

গৃহস্থ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন। সুতরাং নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। অনেককে অনেক সময়ে গৃহীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতি গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। গৃহস্থ দ্বারা পরিশ্রমে অক্ষম অনেক আত্মীয় স্বজন প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ হিন্দু আর্য্য-সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেন। সুতরাং পরের উপকারের উদ্দেশেই গৃহস্থকে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে হইয়া থাকে। আত্ম-সুখ-সাধন ও আত্মোদর পূরণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত গৃহস্থকে এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের উপযোগী করিয়া তুলিত। দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যায় গৃহী এখন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াছেন। ভোগ-বিলাস ও সৌখীন ভাব, সমস্ত দূর হইয়াছে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও সংযতচিত্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সংসারের প্রলোভন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না, শোক দুঃখ তাঁহাকে কাতর করিতে সমর্থ হইতেছে না, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইতেছে না। তিনি প্রথম আশ্রমে থাকিয়া আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বলে তাঁহার হৃদয় বলীয়ান্ হইয়াছে। তিনি সংসারক্ষেত্রে—পাপতাপের রাজ্যে অটল গিরিবরের ন্যায়, অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ফলকামনা-শূন্য ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, এবং অতিথি, অভ্যাগত ও আর্ত্তজনের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া ভূলোকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিতেছেন। দান, গৃহস্থের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরি-

গণিত। কি শ্রাদ্ধকর্ম্ম, কি ব্রত-কর্ম্ম, কি দেবসেবা, কি শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সমস্ত বিষয়েই গৃহস্থকে দান করিতে হইত। অন্যান্য আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত। ব্রহ্মচারী গৃহস্থের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, বানপ্রস্থ ব্যক্তি গৃহীর প্রদত্ত দানে জীবন ধারণ করিতেন, এবং যতী গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। গৃহী দান-ধর্ম্মের মহিমায় এইরূপে সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া, সংসারক্ষেত্র গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেন। হিন্দুধর্ম্মে গৃহস্থের সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন আছে,—"সর্ব্বদা অন্নদান করিবে, ক্ষমা দেখাইবে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্ট থাকিবে, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিবে। রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দিবে। মঙ্গলেচ্ছু ধীমান্ ব্যক্তি দীন দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতি কৃপা-পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য ও অন্নদান করিবেন।" গৃহস্থাশ্রমের কি শান্তিময়, কি পবিত্রতাময় চিত্র! গৃহীর কি অপূর্ব্ব দেব-ভাব! প্রাচীন আর্য্যসমাজে গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্যের পর এইরূপ দেবভাবে পূর্ণ হইয়া, নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেন।

বানপ্রস্থ।

গৃহস্থ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মাচরণের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে পারে। তিনি বিষয়-সুখে প্রমত্ত থাকিয়া অনন্ত স্বর্গীয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন; এই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ বানপ্রস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন গৃহস্থের কেশ শ্বেত হইত, দেহের চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িত,

যখন তিনি পুত্রের পুত্র দেখিয়া সুখী হইতেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার সংসার পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি পুত্রগণকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশে বনে প্রবেশ করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে "বানপ্রস্থ" বলা যাইত। তাঁহার স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে তাঁহার অনুগমন করিতেন। বানপ্রস্থ ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন। তিনি কিছুকাল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থাশ্রমের অনুরূপ ছিল না। বানপ্রস্থকে মানসিক অনুষ্ঠান মাত্র করিতে হইত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই মনে মনে স্মরণ করিতেন। এইরূপ করিলেই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফল লাভ হইত। কিছু দিন পরে এই অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইত। বানপ্রস্থ ব্যক্তি তখন নানাবিধ তপ করিতে আরম্ভ করিতেন। স্বার্থ-পরতার বশবর্ত্তী হইয়া বা পরলোকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, বানপ্রস্থ ব্যক্তির এইরূপ ধারণা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিত। তিনি নিষ্কামভাবে, নির্ব্বিকার চিত্তে ধর্ম্মাচরণ করিতেন।

গৃহী গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, দেবারাধনা করিয়াছেন, পবিত্র চিত্তে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছেন এবং ফলকামনা-শূন্য হইয়া আর্ত্ত-জনকে আশ্রয় দিয়াছেন। দেবভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, দেবারাধনায় তাঁহার মন সংযত হইয়াছে, এবং দেবসেবায় তাঁহার নিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া, চিত্তসংযম, অন্তর-শুদ্ধি, এবং ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার

অধিকারী হইয়াছেন। এখন জীবনের শেষ অবস্থায় একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। পবিত্র বেদান্ত এখন তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই গ্রন্থের সাহায্যে অনাদি, অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যানে সংযত হইয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে এখন ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, নিসর্গের কমনীয় শোভা বিরাজ করিতেছে। ফলপুষ্পযুক্ত-নানাবৃক্ষ-সমাকীর্ণ বিজন অরণ্যের সুন্দর দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, পর্ব্বত-কন্দরের গম্ভীরভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ গাম্ভীর্য্যে আনত হইয়াছে, এবং স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বতী বা নির্ঝরিণীর কোমল শব্দে তাঁহার হৃদয় কোমল-তর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্যে—ঈশ্বরের এই সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে যোগাসনে সমাসীন হইয়া নীরবে, নিস্পন্দভাবে সেই যোগীকুল-ধ্যেয় পরাৎপরের পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।

যাহাতে ভোগ-লালসা দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে অনুরাগ জন্মে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই বনবাস তাঁহার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ছিল না। ইহা তাঁহার একটি পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাঁহারা যথানিয়মে ছাত্র ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা এই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মানব-হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় রিপুর দমন জন্য প্রথমে দুই অবস্থায় শিক্ষালাভ করা অতি আবশ্যক। এই শিক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে গৃহী বানপ্রস্থ হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি-যোগসহকারে ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন। মনু

কহিয়াছেন, "বানপ্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকিবে, শীত ও আতপ প্রভৃতির প্রভাব সহ্য করিতে যত্নশীল হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনঃসংযম রক্ষা করিবে, প্রত্যহ দান করিবে এবং সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে" বানপ্রস্থ ব্যক্তি এইরূপে ভোগসুখে নিস্পৃহ হইয়া, নিসর্গ-রাজ্যের মনোহর স্থানে পরম ব্রহ্মের চিন্তা করিতেন। তপস্যার মহিমায় তিনি মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতেন, ক্রমে সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দের আনন্দ-স্রোতে তাঁহার হৃদয় ভাসিতে থাকিত। তিনি সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে, সেই বরণীয় দেবের ধ্যানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে উদ্যত হইতেন।

ভৈক্ষ্য।

ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সাধকের এই শেষ অবস্থাই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের শেষ আশ্রম। এই আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসী সংসারের অনিত্যতা ও আত্মার নিত্যতা চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। তিনি তখন কর্ম্ম-ফল কামনা করিতেন না, স্বকৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গ-সুখও ইচ্ছা করিতেন না। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভেই তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিত। তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া ব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেন।

প্রাচীন হিন্দু-আর্য্য-সমাজের এই আশ্রম চতুষ্টয় পরস্পরের সহিত কেমন সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। যেমন সোপানের পর সোপান অতিক্রম না করিলে মন্দিরে উপনীত হওয়া যায় না, সেইরূপ এই আশ্রম চতুষ্টয়ের একটির পর একটি অতিক্রম না করিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চতম

প্রদেশে ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিয়া শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সংগ্রহ করিতে হইবে, গৃহস্থ হইয়া, দেবারাধনা প্রভৃতি দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মনঃসংযম উপার্জ্জন করিতে হইবে, অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে, শেষে এই শেষ আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে, এবং শেষে এই আশ্রমে থাকিয়া অবিনাশী পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যাইবে।

প্রাচীন হিন্দু-সমাজে জীবনের শেষ অবস্থায় এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া, ধর্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যে বাস করিলে বা সন্ন্যাসী হইলেই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ইহা হিন্দু আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ন্যায় তাঁহারাও জানিতেন যে, বনে বাস করিলেও লোকের মন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কালীময় হইতে পারে। আমাদের ন্যায় তাঁহাদেরও বোধ ছিল যে, সমাজের জনতা ও গোল-যোগের মধ্যেও মানব-হৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম থাকিতে পারে। সেই আশ্রমে মানব প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এজন্য নিষ্ঠাবান্, আত্মসংযত হিন্দু কখন কখন গৃহস্থা-শ্রমে থাকিয়াও যোগাভ্যাস করিতেন; রাজর্ষি জনক গৃহস্থ হইয়াও পরমাত্মনিষ্ঠ যোগী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "বানপ্রস্থ হইলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের প্রকৃত চর্চ্চা করিলেই কেবল ধর্ম্মলাভ হয়।" মনুসংহিতাতেও ঠিক এই ভাব দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে:—"হে ভারত! সংযমী লোকের অরণ্য বাসের

প্রয়োজন কি, এবং অসংযমীরই বা অরণ্যের আবশ্যকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণ্য, সেই: স্থানই আশ্রম।

"মুনি যদি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গৃহে বাস করেন, আর চিরদিন যদি শুদ্ধাচারী ও দয়াশীল থাকেন, তাহা হইলেই তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

"আত্মা পবিত্র না হইলে দণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার-বহন, মুণ্ডন, বল্কল ও অজিন-পরিধান, ব্রত-পালন, অভিষেচন, যজ্ঞ, বনে বাস, ও শরীর-শোষণ, সমস্তই নিষ্ফল।

হিন্দু আর্য্যগণ উল্লিখিত চারি আশ্রমের নিয়ম সম্বন্ধেও এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন! তাঁহারা জানিতেন যে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে গৃহে থাকিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়। কিন্তু গৃহে থাকিলে পাছে কোনরূপ সাংসারিক প্রলোভনে পড়িতে হয়, পাছে তাঁহাদের চিত্তসংযমের কোন ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শেষ জীবনে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে যাইয়া, ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন।

চতুর্থ পাঠ।

(খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০ অব্দ)

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম।

শাক্য সিংহ—তাঁহার জীবনী—তাঁহার মত ও অনুশাসন—বৌদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উৎপত্তি—প্রথম সঙ্গীতি—দ্বিতীয় সঙ্গীতি—সেকন্দর শাহ—মগধ সাম্রাজ্য—গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণ—অশোক—তৃতীয় সঙ্গীতি—কনিষ্ক—চতুর্থ সঙ্গীতি—বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের কারণ—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ফল—হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য—পৌত্তলিকতা ও কথকতার আবির্ভাব—হিউএন্থসাঙ—তাঁহার জীবনী—তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা—ধর্ম্ম-বিপ্লবে হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতি—ধর্ম্ম-বিপ্লবের মন্দ ফল—বিক্রমাদিত্য—কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।

শাক্য সিংহ।

ব্রাহ্মণগণ দীর্ঘকাল আপনাদের প্রাধান্য এক ভাবে রাখিতে পারেন নাই, দীর্ঘকাল তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। কিছু কালের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এক মহামনস্বী প্রাদুর্ভূত হইলেন, এবং সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়া তুলিলেন। এই মহামনস্বীর নাম শাক্য সিংহ, সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধ।

শাক্য সিংহের জীবনী।

শাক্য সিংহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্যে ক্ষত্রিয়-বংশের এক শাখা শাক্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ আছে, ইক্ষ্বাকু-বংশের এক ব্যক্তি পিতৃ-শাপে গৌতমবংশীয় কপিলের

আশ্রমে যাইয়া এক শাক (সেগুন) বৃক্ষের নীচে বাস করিয়াছিলেন। শাকবৃক্ষ ও আশ্রয়-দাতা কপিলের বংশের নাম অনুসারে এই বংশের নাম শাক্য ও গৌতম হয়। এই শাক্যকুলে ও গৌতমবংশে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন বারাণসীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরে মধ্য দেশের উত্তর-পূর্ব্ব খণ্ডের রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তঃপাতী কপিলবস্তু-নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কপিলবস্তু নগরের লুম্বিনী নামক উদ্যানে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। কেহ কেহ কহেন, এখনকার গোরক্ষপুর জেলার নগরখাস-নামক পল্লী শুদ্ধোদনের রাজধানী প্রাচীন কপিলবস্তু।

শাক্যসিংহের এক নাম সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ শব্দের অর্থ, যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শাক্য-কুলে ও গৌতম-বংশে জন্ম হওয়াতে তিনি শাক্যসিংহ ও গৌতম নামেও প্রসিদ্ধ হন। শাক্যসিংহের অর্থ, শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ। শাক্যসিংহ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়। বুদ্ধ শব্দের অর্থ, জ্ঞানী।

শাক্যসিংহের জন্ম গ্রহণের সাত দিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলেও শাক্যসিংহকে কোন কষ্টে পড়িতে হয় নাই। শুদ্ধোদন, তনয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আর এক মহিষীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই মহিষী শাক্যসিংহের মাতার ভগিনী। শুদ্ধোদন মায়াদেবীর জীবদ্দশাতেই ইহাঁকে বিবাহ করেন।

শাক্যসিংহ দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও বড়

তীক্ষ্ণ ছিল। শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার রূপবান্ ও বুদ্ধিমান্ তনয় অতঃপর পবিত্র সূর্য্যবংশের অনুমোদিত যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। শাক্যসিংহ অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি বাল্যকালেই চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন, সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বসিয়া চিন্তা করিতেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে চিন্তা হইতে বিরত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি জন্মাইবার জন্য পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে ইহার আয়োজন হইল। শাক্যসিংহ উনিশ বৎসর বয়সে দণ্ড-পাণির কন্যা পরমসুন্দরী গোপার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের নয় বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই সন্তানে নাম রাহুল।

শাক্যসিংহ গৃহস্থ হইলেন বটে, কিন্তু চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি শকট আরোহণে প্রমোদ-উদ্যানে যাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা, মৃত ব্যক্তির শোচনীয় বিকার দেখিয়া পার্থিব সুখে বিতৃষ্ণ হইলেন। অবশেষে একটি ভিক্ষু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ভিক্ষুর সৌম্য মূর্ত্তি, ভোগ-সুখে বিরতি ও ধর্ম্ম-চিন্তায় আসক্তি দেখিয়া, তিনি সুখী হইলেন। অতঃপর পার্থিব সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভিক্ষুর ন্যায় ধর্ম্ম চিন্তা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। প্রিয়তম রাহুল, প্রণয়িনী গোপা বা ভক্তিভাজন জনকজননীর মমতায় তিনি আর বিমুগ্ধ রহিলেন না। উনত্রিশ বৎসর বয়সে, শাক্যসিংহ একদা গভীর নিশীথে পরিজনবর্গের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

অশ্বারোহণে সমস্ত রাত্রি গমন করেন। সঙ্গে কেবল তাঁহার সেই বিশ্বস্ত শকট-চালক ছিল। শাক্যসিংহ এক স্থানে আসিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন, এবং শকট-চালককে আপনার পরিচ্ছদ ও সমস্ত অলঙ্কার দিয়া কপিলবস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে শাক্যসিংহ তাঁহার অনুচরকে বিদায় দেন, সেই খানে একটি স্মরণ-স্তম্ভ ছিল। চীন দেশের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হিউএ ন্থসাঙ কুশী নগরে যাইবার পথে একটি বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তভাগে এই স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। কুশী নগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ইহা এখন ভগ্ন দশায় রহিয়াছে। অধুনা এই স্থান কশিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে।

শাক্যসিংহ প্রথমে বৈশালীতে (বিশার, গণ্ডক নদের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী) এক জন ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। কিন্তু এ শিক্ষা তাঁহার মনোমত হইল না। ইহার পর তিনি বিহারের রাজধানী রাজগৃহে (আধুনিক রাজগির) আর এক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট আসিলেন। এ ব্রাহ্মণও তাঁহাকে অভীষ্ট বিষয় শিক্ষা দিতে অসমর্থ হইলেন। শাক্যসিংহ এইরূপে বিফল-মনোরথ হইয়া পাঁচ জন সহাধ্যায়ীর সহিত গয়া জেলার কোন পল্লীতে ধর্ম্ম-চিন্তায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। অনন্তর বুদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধিবৃক্ষ-মূলে তিনি সমাধিগত হইয়া তপস্যা ও যাগযজ্ঞের অনাবশ্যকতা এবং ইন্দ্রিয়-দমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এখন তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়সে "বুদ্ধ" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

বুদ্ধ প্রথমে বারাণসীতে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি দ্বিজের

ন্যায় ছাত্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, দ্বিজের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, দ্বিজের ন্যায় বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-চিন্তায় তৎপর হইয়াছিলেন, শেষে দ্বিজের ন্যায় ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারে দ্বিজাতির রীতির অনুসরণ করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা কেবল আপনার সম্প্রদায়ের লোককে পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বুদ্ধ জাতি-ভেদ, সম্প্রদায়ভেদ না করিয়া অকুতোভয়ে সকলের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিন মাসের মধ্যে তাঁহার ষাটি জন শিষ্য হইল। তিনি এই শিষ্যদিগকে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কয়েক জন সন্ন্যাসী ও কতিপয় অগ্নি-পূজক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বুদ্ধ এই শিষ্যদল লইয়া রাজগৃহে যাইয়া রাজা অজাতশত্রু ও তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রজাকে নিজধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই অজাতশত্রুর পিতা বিম্বসার বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বুদ্ধ এইরূপে অযোধ্যা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অযোধ্যা, বুদ্ধগয়া রাজগৃহ, শ্রাবস্তী (রাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান সাহেতমাহেত) তাঁহার প্রধান প্রচারস্থল ছিল। এজন্য এই কয়েক স্থান বৌদ্ধ দিগের পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধ বৎসরের আট মাস নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, বর্ষার চারি মাস কোথাও যাইতেন না, প্রায়ই রাজগৃহের নিকটে থাকিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন। এইরূপে সাধা-রণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া, বুদ্ধ জন্মভূমি কপিলবস্তুতে গমন করেন। শুদ্ধোদন যে পুত্রকে এক সময়ে অলঙ্কার-ভূষিত ও যৌবন-শ্রী-

সম্পন্ন দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে মুণ্ডিতমস্তক, পীত-চীরধারী, হাতে ভিক্ষাভাজন, ভ্রমণকারী ভিক্ষুর বেশে সমাগত দেখিলেন। এই প্রশান্ত দৃশ্যে—স্বার্থত্যাগের এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে বৃদ্ধ রাজার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি ভক্তির সহিত পুত্রের উপদেশ গ্রহণ করিলেন, রাহুল ও গোপাও প্রফুল্ল হৃদয়ে বৌদ্ধ হইলেন; ক্রমে শাক্যবংশের অনেকে আসিয়া তাঁহার পদানত হইল। বুদ্ধ আপনার জন্ম-ভূমিতে আপনার কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইলেন।

চুয়াল্লিশ বৎসর কাল বুদ্ধ এইরূপে নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। একদা তিনি শিষ্যগণের সহিত কুশীনগরে যাইতে-ছিলেন, পথে উদরাময় রোগে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি একটি শাল বৃক্ষের নীচে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। এই বৃক্ষের নীচেই আশী বৎসর বয়সে তাঁহার পর-লোক প্রাপ্তি হইল। খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

বুদ্ধের মত ও অনুশাসন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বুদ্ধের বিশ্বাস ছিল না। তিনি কহিয়াছেন, জগতের কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, ইহা চিরকাল এক অবস্থায় আছে। বুদ্ধ পুনর্জন্ম মানিতেন। তাঁহার মতে জীব আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। এইরূপ বহু জন্মের পর জীব যখন আপনার সৎকার্য্য ও সাধনা-বলে বুদ্ধ হইয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়, তখন তাহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাণ অর্থাৎ আত্মার বিধ্বংসই বৌদ্ধ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। বুদ্ধের মতে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া-

কাণ্ড নিষ্ফল। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সমুদয় রিপুকে নির্ম্মূল করিয়া সমাধিবলে নির্ব্বাণ লাভ করাই উচিত। সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সত্য-নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অহিংসা এই ধর্ম্মের সার। বুদ্ধ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না, সমুদয় বর্ণের লোককেই আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ যে বৈষম্য-প্রণালী স্থাপন করেন, বুদ্ধ তাহা উচ্ছেদ করিয়া, সাম্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন।

বুদ্ধ কহিয়াছেন, সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্ম আচরণ করিবে। ধর্ম্মাচরণের পুরস্কার পরিণামে সুখভোগ নহে, উহা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মার বিধ্বংস। শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধের দশটি অনুশাসন এই—

১। জীব হত্যা করিবে না।

২। চুরি করিবে না।

৩। পরস্ত্রী গমন করিবে না।

৪। মিথ্যা কথা কহিবে না।

৫। মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৬। যে আহার কালোচিত নয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৭। আড়ম্বর-পূর্ণ প্রকাশ্য দৃশ্য সকল পরিহার করিবে।

৮। ব্যয়-সাধ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিবে না।

৯। বিস্তৃত শয্যায় শুইবে না।

১০। স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিবে না।

সকল শ্রেণীর লোকেই বুদ্ধের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক বা পুরোহিত হইতে পারেন। পুরোহিতকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইঁহাদের সাধা-

রণ নাম ভিক্ষু। ভিক্ষুর ধর্ম্মানুষ্ঠান বড় কষ্ট-সাধ্য। ভিক্ষু শ্মশান-ভূমি হইতে সংগৃহীত চীর ব্যতীত অন্য কোন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারিবেন না; এই চীরখণ্ডগুলি তাঁহাকে নিজ হাতে সেলাই করিতে হইবে। তিনি চীর পরিচ্ছদের উপর হরিদ্রাবর্ণ একটি লম্বা অঙ্গচ্ছদ ধারণ করিবেন। তাঁহাকে অনাবৃত পদে, দারুময় ভিক্ষা-ভাজন হস্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পূর্ব্বক অতি সামান্যভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্নে একবার মাত্র ভোজন করিবেন এবং নগর ও পল্লীগ্রাম হইতে দূরে থাকিবেন। অরণ্য তাঁহার আবাস-গ্রাম ও আরণ্য বৃক্ষের ছায়া তাঁহার আশ্রয়-স্থল হইবে। তিনি ভিক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লী বা নগরে যাইতে পারিবেন, কিন্তু রাত্রির পূর্ব্বেই তাঁহাকে আপনার বাস-স্থান অরণ্যে আসিতে হইবে। তিনি কোন কোন রাত্রিতে সমাধি-ভূমিতে যাইয়া, সংসারের অপূর্ণতা ও অস্থায়িত্বের বিষয় চিন্তা করিতে পারিবেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর ব্রতাচরণ, এইরূপ শীলতা, ধৈর্য্য, সাহস ও ধ্যানের এক মাত্র উদ্দেশ্য অন্তিমে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি, পরজীবনে অনন্ত সুখভোগ নহে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ এক সময়ে এইরূপ বিষয়-নিস্পৃহা ও এইরূপ আত্ম-সংযমের পরিচয় দিতে ক্রুটি করেন নাই। কোন কোন বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা বা অঙ্গহানি থাকিলেও এক সময়ে সাধু পুরুষগণ ইহার জন্য কঠোর তপস্যায় নিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহার জন্য ধীর ভাবে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য সকল সম্প্রদায়কে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার সমদর্শিতার একশেষ দেখাইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত বুদ্ধের মত সকল তাঁহার শিষ্যগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পাঁচ শত শিষ্য গুরুর মৌখিক উপদেশ সকল গ্রন্থ-বদ্ধ করিবার জন্য রাজগৃহের নিকটে সমবেত হন। শিষ্যগণ বুদ্ধের সমুদয় উপদেশ ও মত আবৃত্তি করিয়া তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। এই তিন অংশের বিষয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের তিন ভাগে বিবৃত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি।

রাজগৃহের এই সমিতি বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম সঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতির অর্থ, গান করা। বুদ্ধ নিজে কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যগণ একত্র হইয়া তাঁহার উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এই জন্য বোধ হয়, বৌদ্ধ সমিতি "সঙ্গীতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়ে অজাতশত্রু বিহারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারক কাশ্যপ এই সঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধের মত ও উপদেশ সকল তদীয় শিষ্য-গণ কর্ত্তৃক যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার প্রথম ভাগ সূত্র, দ্বিতীয় ভাগ বিনয় এবং তৃতীয় ভাগ অভিধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সূত্রে শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ-বাক্য, বিনয়ে বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বিধি এবং অভিধর্ম্মে বুদ্ধের ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণ আছে। এই সংগ্রহত্রয় ত্রিপিটক নামে অভি-হিত হয়। কাশ্যপ সূত্র-পিটকের, আনন্দ বিনয়-পিটকের এবং উপালি অভিধর্ম্ম-পিটকের সংগ্রহ-কর্ত্তা।

প্রথম সঙ্গীতি।

ইহার এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির

দ্বিতীয় সঙ্গীতি।

অধিবেশন হয়। সাত শত বৌদ্ধ এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এই এক শত বৎসরে বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে মত-বিরোধ জন্মে। এই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। বৌদ্ধেরা দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে ইঁহাদের মধ্যে আবার আঠারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হইল।

সেকেন্দর শাহ।

পরবর্ত্তী দুইশত বৎসরে অনেক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং হিন্দুকুশ অতিক্রম পূর্ব্বক কান্দাহারে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে আর দুইটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত। এই বিষয়-দ্বয়ের একটি মহাবীর সেকন্দর শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ, অপরটি সুপ্রসিদ্ধ মগধ সাম্রাজ্যের বিবরণ।

মহাবীর সেকন্দর শাহ গ্রীশ দেশের অন্তঃপাতী মাকিদনের রাজা। পূর্ব্বে পারশ্য দেশের রাজারা বড় পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অন্যতম পারশীক রাজা দরায়ুস্ হস্তাস্প্ একবার সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। কালে পারশ্য রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইলে সেকন্দর পারশ্য অধিকার করিয়া খৃষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং আটকের উজানে সিন্ধু নদ

পার হইয়া বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় তক্ষশিলা দিয়া, বিতস্তার নিকটে আইসেন। এস্থলে বলা উচিত যে, তক নামে তুরেণীয় জাতি হইতে এই নগরের নাম "তক্ষশিলা" হয়। এই জাতি রাবলপিণ্ডীর আদিম নিবাসী। এ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সেকন্দর আসিয়া দেখিলেন, পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একতা নাই, রাজারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তাঁহার সাহায্যে উদ্যত। কিন্তু সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য হইলেন না। পুরু নামে এই খণ্ড-রাজ্যের এক জন রাজা ত্রিশ হাজার পদাতি, চারি হাজার অশ্বা-রোহী, তিন শত যুদ্ধরথ ও দুই শত হস্তী লইয়া সেকন্দরের বিরুদ্ধে বিতস্তার নিকটে উপনীত হইলেন। যে চিলিয়ানবালায় শিখগণ ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছিল,তাহারই প্রায় ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে সেকন্দরের সহিত পুরুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেক-ন্দর বিজয়ী হন। কিন্তু তিনি বিজয়-গৌরবে স্ফীত হইয়া বিজিতের প্রতি কোন রূপ অসম্মান দেখান নাই। সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীর আসাধারণ সাহস, পরাক্রম ও দেশ-হিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরু এইরূপে আপনার বিজেতার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। সেকন্দর আপনার জয়লাভের স্মরণ-সূচক দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। একটির নাম বুকফল। সেকন্দরের প্রিয়তম বাহন বুকফল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয়। ইহা বিতস্তার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান জলাল-পুরের নিকট অবস্থিত ছিল। আর একটির নাম নিকেয়া,

বিতস্তার পূর্ব্ব পারে। অধুনা এই স্থান মঙ্গ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর সেকন্দর অমৃতসর দিয়া বিপাশার তটে উপনীত হন। শিখ ও ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধক্ষেত্র সোব্রাওর নিকটে তাঁহার জয়-শ্রী-সম্পন্ন সৈন্য আপনাদের জয়-পতাকা উড্ডীন করে। সেকন্দর পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তটে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য তাঁহারা অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সেকন্দর ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি দক্ষিণ পঞ্জাবে আলেক্জেণ্ড্রিয়া, এবং সিন্ধুদেশে পটল নামে নগর স্থাপন করেন। আলেক্জেণ্ড্রিয়া, এখন উচ্ নামে প্রসিদ্ধ। পটল সিন্ধুর বর্ত্তমান রাজধানী হয়দরাবাদ।

সেকন্দর পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন প্রদেশ আপনার অধীন করেন নাই। পরাজিত রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপন, অভিনব নগর প্রতিষ্ঠা এবং তৎসমুদয়ে গ্রীক সৈন্যের সন্নিবেশ-কার্য্যেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আফগানিস্তানের সীমান্তভাগ হইতে বিপাশা পর্য্যন্ত, এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত, প্রায় সমস্ত ভূভাগ তাঁহার বিজয়-চিহ্নে অঙ্কিত ছিল। তিনি অনেক রাজ্য আপনার সাহায্যকারী সামন্তদিগকে দান করেন। উত্তর পঞ্জাবের তক্ষশিলা ও নিকেয়াতে, দক্ষিণ পঞ্জাবের আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে এবং সিন্ধুর পটলে গ্রীকদিগের অথবা বন্ধু রাজগণের সেনা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাক্ট্রিয়াতে (বলখ) অনেকগুলি সৈন্য অবস্থান করে। সেকন্দরের মৃত্যুর

পর তদীয় সাম্রাজ্য-বিভাগ সময়ে সেলুকস্ নিকেতর নামে গ্রীক সেনাপতি এই বাক্ট্রিয়া এবং ভারতবর্ষের অংশ প্রাপ্ত হন।

মগধ সাম্রাজ্য।

এই সময়ে গঙ্গার তটে একটি অভিনব রাজ-শক্তি সমুত্থিত হয়। আপনার জন্য কোন রাজ্য লইবার অথবা আপনার কোন শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার ইচ্ছা করিয়া, যে সকল সাহসী ও সমর-পটু ভারতীয় বীর সেকন্দর শাহের শিবিরে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সমকালে রাজগৃহ মগধের (বিহারের) রাজধানী ছিল। কিন্তু অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর স্থাপন করেন। এই অবধি পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী হয়। সেকন্দরের সমকালে নন্দবংশীয় শূদ্র রাজারা পাটলীপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের এক জন রাজার মুরা নামে একটি দাসীর পুত্র। এজন্য তিনি মৌর্য্য বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত পরিশ্রান্ত গ্রীকদিগকে গঙ্গার প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত শস্য-সম্পত্তি-পূর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে আসিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। চন্দ্রগুপ্ত ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। আপনার বাহুবল, ইহার উপর চাণক্যের মন্ত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মগধ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা ছিল। এক জন সাহসে, বীরত্বে ও মন্ত্র-শক্তিতে প্রবল হইলে অপরের সিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনার অভীষ্ট কার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। অনার্য্যেরা

আর্য্য ধর্ম্মের অনুমোদিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। তাহাদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছিল। তাহারা যে, নীচ-বংশ-সম্ভূত, বিজেতা আর্য্যদের অনুকম্পা-বলে যে, তাহাদের অবস্থা কিয়দংশে উন্নত হইয়াছে, ইহা এখনও তাহাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এদিকে অপেক্ষাকৃত দাম্ভিক ও উদ্ধত আর্য্যদের দোষে তাহারা সময়ে সময়ে নিগৃহীত হইত। এই সকল আর্য্য তাহাদের বংশের হীনতা ও তাহাদের পূর্ব্বতন অসভ্যতার উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন। সুতরাং শূদ্রেরা যে কোন উপায়েই হউক, আপনাদের প্রাধান্য ও দ্বিজাতির উপর আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। যখন মহামতি শাক্যসিংহ সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী ইতর, সকলকে এক ভূমিতে একত্র করিবার চেষ্টা করেন, তখন শূদ্রেরা আশ্বস্ত হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। ইহার পর অনার্য্য-বংশ-সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত যখন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার ইচ্ছা করেন, তখন অনেকে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। চন্দ্রগুপ্ত অবিলম্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং নন্দবংশের ধ্বংশাবশেষে আপনার গৌরবের মহিমায় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হন। এই চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) পর্য্যন্ত, তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়া-ছিল। পূর্ব্বতন রাজগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-

সম্পন্ন হইলেই আপনাকে "মহারাজচক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক এই গৌরব-সূচক উপাধি লাভ করেন। যে শূদ্রদিগকে আর্য্যেরা দাস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই এখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসের বরণীয় হইয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের নাম তাঁহাদের শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর কোন রাজা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

সেলুকস খ্রীষ্টাব্দের ৩১২ হইতে ২৮০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরিয়ায় রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টাব্দের ৩১৬ হইতে ২৯২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মগধসাম্রাজ্য শাসন করেন। সেকন্দরের মৃত্যুর পর সেলুকস যখন স্বীয় রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার অধিকার প্রসারিত করেন। এই উভয়ের রাজ-শক্তি যখন বদ্ধমূল হয়, তখন উভয়ে আত্ম-প্রাধান্য দেখাইবার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মুখীন হন। এ যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হয়। পরাক্রান্ত সেকন্দর শাহ পুরুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেকন্দরের সেনাপতি পরাক্রান্ত সেলুকস, চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অনুদার-প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি এই বীরত্ব-লব্ধ বন্ধুতার গৌরব হরণ করিলেন না, সেলুকসকে আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া

পাঁচ শত হস্তী উপহার দিলেন। এ দিকে সেলুকস পঞ্জাব-স্থিত গ্রীক অধিকারের সহিত আপনার প্রিয়তমা দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর বিবাহ হইল। সেলুকস জামাতার সভায় এক জন দূত রাখিলেন। এই দূতের নাম মেগাস্থিনিস্। ইনি খৃষ্টাব্দের অনুমান ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রে ছিলেন।

গ্রীক-লিখিত বিবরণ।

মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও কোন কোন স্থলে অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিবরণ মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চারি দিক গড়খাই করা। গড়ের বিস্তার ৪০০ হাত এবং গভীরতা ৩০ হাত। গড়ের পর আবার একটি কাষ্ঠময় প্রাচীর। প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি বুরুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাণ নিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিদ্র ছিল।

ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত। প্রতিরাজ্যে অনেক গুলি নগর ছিল। সে সকল নগর নদী-তটে বা সাগরের উপকূলে অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; আর যে গুলি পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত,সে গুলি ইষ্টক বা মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীয়েরা নিম্ন-লিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল;—

১ম শ্রেণী। তত্ত্ববিৎ।—ইহাঁরা সকল সম্প্রদায়ের মান্য এবং যাগ যজ্ঞে লোকের সাহায্য-দাতা ছিলেন। বৎসরের প্রারম্ভে ইহাঁরা একবার রাজসভায় আহূত হইতেন। কেহ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা মারীভয়প্রভৃতিতে সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকিলে, তাহা এই সময় সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। রাজা পূর্ব্বে এই সকল বিষয় জানিয়া বিপদ নিবারণে যত্নশীল হইতেন। এসময়ে যদি কেহ তিন বার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইত; আর যিনি প্রামাণিক কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি কর-ভার হইতে বিমুক্ত হইতেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ দুই দলে বিভক্ত:—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণেরই সম্মান অধিক। ইহাঁরা বাল্যকাল হইতেই নগরের বহিঃস্থ উপবনে বাস করিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ইঁহাদিগকে মাংসাহার ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বিরত থাকিতে হইত। ইঁহারা মিতাচার অবলম্বন পূর্ব্বক কুশাসন বা মৃগচর্ম্মের শয্যায় শয়ন করিতেন। ৩৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিয়া, ইঁহারা গৃহস্থ হইতেন। তখন ইহাঁরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান, স্বর্ণাভরণ ধারণ ও মাংসাহার করিতেন, এবং বহুসন্তান কামনায় বহু নারীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন।

শ্রমণেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল বনে বাস করিতেন। আরণ্য বৃক্ষেরপত্র ও ফল ইঁহাদের প্রধান খাদ্য, এবং আরণ্য বৃক্ষের বল্কল ইঁহাদের পরিধেয় ছিল। কোন বিষয় জানিতে হইলে, রাজারা ইঁহাদের নিকটে দূত পাঠাইতেন।

অপর দল, ভিষক্। ইঁহারা যদিও লোকালয়ে বাস করিতেন, তথাপি মিতাচারী ছিলেন, সাধারণতঃ ভাত বা যবের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ইঁহাদের ঔষধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহারা তৈল ও প্রলেপকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদের পথ্যের ব্যবস্থায় রোগের উপশম হইত।

২য় শ্রেণী। কৃষক।—দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর, নম্র-স্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইহাদিগকে অন্য কাজ করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এরূপও দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, নিকটে কৃষকগণ অবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। কৃষকেরা আপনাদের স্ত্রী পুত্রের সহিত গ্রামে বাস করিত, কখনও নগরে যাইত না। সৈন্যগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। প্রায় সমস্ত জনপদই শস্য-সম্পত্তি-শোভিত ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত ছিল। রাজাই ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ পাইত। এইরূপে প্রতিবৎসর অনেক শস্য রাজকীয় ভাণ্ডারে জমা হইত। ইহার কতক অংশ ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইত, কতক অংশ রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের ভরণপোষণ, এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষাদির নিবারণ জন্য রাখা হইত।

৩য় শ্রেণী। পশু-পালক ও শিকারী।—পশু-পালন, পশু-বিক্রয় ও শিকার ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা হিংস্র পশু সমূহের হত্যায় নিযুক্ত থাকিত, এবং শস্যের অনিষ্টকারী বিহঙ্গ-কুল বিনষ্ট করিয়া কৃষকের উপকার করিত। নগরে বা পল্লীতে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-গৃহ ছিল না। ইহারা প্রায়ই এক

স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এজন্য ইহারা তাম্বুতে বাস করিত।

৪র্থ শ্রেণী। শিল্পকর।—ইহাদের কেহ যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম্ম, কেহ কৃষি-কার্য্যের জন্য যন্ত্র, কেহ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কোন কোন শিল্পকরকে কর দিতে হইত, কিন্তু যাহারা রাজার জন্য জাহাজ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত, তাহারা রাজকোষ হইতে আপনাদের ভরণ পোষণের খরচ পাইত। প্রয়োজন অনুসারে বণিকেরা রাজকীয় তরীর অধ্যক্ষের নিকটে আবেদন করিয়া, এই সকল জাহাজ ভাড়া করিয়া লইত।

৫ম শ্রেণী। যোদ্ধা।—ইহারা সুশিক্ষিত ও যুদ্ধ-কুশল ছিল। সংখ্যায় ইহারা কেবল কৃষকদিগের নীচেই স্থান পাইত। শান্তির সময়ে ইহাদের কোন কাজ থাকিত না। তখন ইহারা কেবল আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইত। সমস্ত সৈন্যের ভরণ পোষণ, এবং যুদ্ধোপকরণ সংরক্ষণের ব্যয়, রাজা নির্ব্বাহ করিতেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণী। চর।—ইহারা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা রাজাকে,—যেখানে রাজা নাই, সেখানে প্রধান শান্তি-রক্ষককে জানাইত।

৭ম শ্রেণী। মন্ত্রী।—ইঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু চরিত্র-গুণ ও অভিজ্ঞতায় অপরাপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সম্মানিত। রাজার পরামর্শ-দাতা, কোষাধ্যক্ষ ও বিচারপতি এই শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধান শান্তিরক্ষক ও সেনাপতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হইত না,কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত লোকের ব্যবসায় অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক অবলম্বন করিত না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত। লোকে ধুতি পরিত, এবং একখানি উত্তরীয়ের কিয়দংশ মাথায় জড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া দিত। কিন্তু যাহারা সৌখীন ও বেশভূষা-প্রিয়, তাঁহারা স্বর্ণ-খচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন। কোন স্থানে যাইবার সময়ে অনুচরগণ তাঁহাদের মস্তকের উপর ছাতা ধরিত। রুচিভেদে লোকে আপনাদের দাড়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছাতা ব্যবহার করিতেন, এবং শ্বেত চর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিতেন। রাজকীয় কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্ম্মচারীগণের মধ্যে এক এক শ্রেণী এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। দেশের লোকে মিতাচারী ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভিন্ন মদ্যপান করিত না, সত্য ও ধর্ম্মের সম্মান করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারি লক্ষ লোক থাকিত, কিন্তু তথায় প্রতি দিন দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। লোকে উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে থাকিত না, কদাচিৎ মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হইত। ইহারা প্রায়ই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিত। দণ্ডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্তপদাদি ছেদন করা হইত। পল্লী-সমাজ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডল পল্লী-সমাজে আধিপত্য করিতেন। ভূমি মাপ-করণ, গ্রামের লোকের মধ্যে বিচার, কৃষিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত

জল-সেচন, করসংগ্রহ, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধাকরণ, পথের সংস্কার, এবং সীমা স্থিরকরণের ভার, ইহাঁর উপর সমর্পিত থাকিত। ভূমি শস্যশালিনী ছিল। বৎসরে দুই বার শস্য কাটা হইত। সুখাদ্য ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তরকীলক সকল স্থানে স্থানে প্রোথিত থাকিত। সাধারণ লোকে অশ্বে, উষ্ট্রে ও গর্দ্দভে চড়িত। রাজা ও ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীতে আরোহণ করিতেন। সৈন্যেরা সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, বড়শা ও খড়্গ ব্যবহার করিত। পদাতিকের এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ, আর এক হস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। ধনুক প্রায় মানুষের সমান, এবং প্রায় তিন গজ লম্বা ছিল। যোদ্ধারা এই ধনুক মাটিতে রাখিয়া, বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বাণ নিক্ষেপ করিত। অসি লম্বায় তিন হাতের অধিক হইত না। শত্রুপক্ষ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, যোদ্ধারা দুই হাতে অসি চালাইত। যুদ্ধ-রথে সারথী ব্যতীত দুই জন রথী, এবং রণ-মাতঙ্গে মাহুত ব্যতীত তিন জন যোদ্ধা থাকিত। উৎসবের সময়ে স্বর্ণ রৌপ্য-বিভূষিত হস্তী, শকট-সংযোজিত সুসজ্জিত অশ্ব ও বলদ, এবং সুশিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। লোকে রত্নখচিত পাত্র, সুশোভন সিংহাসন ও বিচিত্র বস্ত্রাদি বহন করিত। পোষিত সিংহ, ব্যাঘ্রও সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সুকণ্ঠ ও সুদৃশ্য বিহঙ্গ-শোভিত বৃক্ষ সকল বৃহৎ বৃহৎ শকটে চালিত হইত। কন্যা বিবাহ-যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে, পিতা কোন কোন সময়ে তাহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; যে কেহ শক্তি প্রকাশ করিয়া কোন বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই

কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কোন স্থানে দাসত্ব-বন্ধন ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব-গৌরব-উন্নতা ছিল। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। রাত্রিতে তিনি এক শয্যায় শুইতেন না, ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় সময়ে সময়ে শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। অস্ত্রধারিণী মহিলারা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ার সময়ে রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

খৃীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দিগের সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে জানা যাইতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর যে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়, মেগাস্থিনিস বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মেগাস্থিনিস যে সাত শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সাত জাতি নহে; এই সকল লোক অবলম্বিত কার্য্য-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল। চর ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। কার্য্য-ভেদে ইহাঁদের শ্রেণী বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু জাতিতে ইঁহারা বিভিন্ন নহেন। ইহার পর মেগাস্থিনিস্ তত্ত্ববিৎ হওয়ার সমন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রমাদ-দূষিত বোধ হয়। যে সে লোক শ্রমণ হইতে পারিত দেখিয়া, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর লোকেই তত্ত্ববিৎ হইতে পারে। কিন্তু জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরা যে, অপর লোককে আপনাদের শ্রেণীতে গ্রহণ করেন না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই কয়েকটি অনবধানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, খৃীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মনুর ব্যবস্থা অনুসারেই সমাজের কার্য্য চলিতে ছিল। ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও মন্ত্রিত্ব করিতেন।

ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন। বৈশ্যেরা শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত ইতর শ্রেণীর লোকেরা পশু-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য করিত। কেবল শূদ্রেরা এ সময়ে মনুর ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহারা দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে দাসত্বের অভাব দেখিয়াছেন। শূদ্রেরা বৈশ্যদিগের ন্যায় শিল্প ও কৃষি-ব্যবসায়ী ছিল।

ভারতবর্ষ একচ্ছত্র ছিল না। যেহেতু মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে ১১৮টি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। কেবল চন্দ্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতা-বলে তাম্রলিপ্ত হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার পূর্ব্বক একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ে এক রাজার অধীন ছিল না, এবং কোন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একতা দেখা যায় নাই।

অশোক।

চন্দ্রগুপ্তের পর মহারাজ অশোকের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের অধিকতর উন্নতি হয়। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। তিনি কার্য্য-কুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে পরাজিত করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ এক সময়ে পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, মালব হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অশোক অতি কদাকার ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর ছিল। এ জন্য তিনি "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর

পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ক্রমে ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় অশোকের প্রতিপত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হয়। অশোক নানাস্থানে মঠপ্রভৃতির নির্ম্মাণে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। এই সকল ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়। তিনি ধর্ম্মাশোক ও প্রিয়দর্শী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বল প্রকাশ করিয়া, বা তরবারির ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও নিজধর্ম্মে আনয়ন করেন নাই, স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইয়া সরল ভাবে সুনীতির উপদেশ দিয়া, সাধারণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রচারে অশোকের এই প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যার পর নাই উন্নতি হয়। মহারাষ্ট্র হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপিয়া পড়ে। ক্রমে সিংহলেও ইহার গতি প্রসারিত হয়। আজ পর্য্যন্ত অশোকের অনুশাসন-লিপি ইউসফ্জী দুন (উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ) হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমে কাটিগড় ও পূর্ব্বে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত, প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানের ও মধ্য প্রদেশের প্রস্তর-স্তম্ভে বা গিরি-গাত্রে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লিপিতে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রাণী-হিংসার প্রতিষেধ, পীড়িত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর জন্য চিকিৎ-সালয় স্থাপন, পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও কূপখনন প্রভৃতির আদেশ রহিয়াছে। মহারাজ অশোক কত বড় সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং সাম্যের মহিমা ঘোষণা পূর্ব্বক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড-সমূহকে একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া, কত দূর

সুরাজকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই সকল অনুশাসন-লিপিতে প্রকাশ পাইতেছে। অশোক স্থানে স্থানে বৌদ্ধদিগের অনেক বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধে বহুসংখ্য বিহার ছিল। এই জন্য উক্ত প্রদেশ এখন 'বিহার' নামে পরিচিত হইতেছে।

তৃতীয় সঙ্গীতি।

অশোকের সময়ে খৃষ্টাব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এক হাজার বৌদ্ধ পুরোহিত এই সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতারক লোকে বৌদ্ধদিগের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, আপনাদের কথা বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে তৎসমুদয়ের সংশোধন হয়।

কনিষ্ক।

অশোকের পর কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কনিষ্ক শকদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আধিপত্য করিয়াছিলেন। কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী ছিল। কনিষ্কের সময়ে কাশ্মীর রাজ্য ইয়ারকন্দ ও কোকন হইতে আগ্রা ও সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চতুর্থ সংগীতি।

কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে খ্রীঃ ৪০ অব্দে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে পাঁচ শত বৌদ্ধ পুরোহিত সমবেত হইয়া, ধর্ম্মগ্রন্থের তিনখানি টীকা প্রস্তুত করেন।

মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরি-

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের কারণ।

পুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা চারি দিকে যাইয়া অহিংসা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ছয় শত বৎসর পরে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশ-বাসীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ভারতবর্ষ হইতে যাবায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট অবনত-মস্তক হইতেছিল, তখন কতিপয় প্রচারক মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে যাইয়া আপনাদের ধর্ম্ম বদ্ধ-মূল করেন। চতুর্থ সঙ্গীতির অব্যবহিত পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবনী শক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৭২ অব্দে কোরিয়া-বাসীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয়-দিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কেহ কেহ বলেন, পালেষ্টাইন্, আলেক্জান্দ্রিয়া, গ্রীশ ও রোমেও বুদ্ধের মত প্রচারিত হয়। যাহা হউক কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে এত সম্প্রসারিত হয় নাই, কোনও ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর এত অধিক লোকে আদর ও সম্মান দেখায় নাই। পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৪০ জন বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হয়। বুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা প্রবল ছিলেন। ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে কেহই সাহসী হইত না। কেবল মহামতি শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অসম সাহসের পরিচয় দেন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে আপনার মত প্রকাশ করেন, ধীরে ধীরে লোকে তাঁহার অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হয়, এবং শেষে ধীরে ধীরে তদীয় ধর্ম্ম পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়ে। যে ধর্ম্মে সুখভোগের প্রলোভন নাই, যে ধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দেয় না, সমুদয় বিষয়ের বিধ্বংসই যে ধর্ম্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্ম কি কারণে এত বহুল-প্রচার হইল, কি কারণে ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকের সহিত মধ্য এশিয়ার অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীরা, সেই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যখন প্রাচীন হিন্দু আর্য্যেরা প্রসন্নসলিলা সিন্ধু সরস্বতীর প্রশস্ত তটে বসিয়া ভক্তিভাবে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি উপাস্য দেবতার উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। শেষে সময়ের পরিবর্ত্তনে কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়, ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব দেখাইতে উদ্যত হন। মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জীব প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটি ক্রিয়ার সহিত আবদ্ধ হইতে থাকে। অনেক যজ্ঞের অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। প্রতি যজ্ঞের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণেরা এই সকল

বিষয়ের একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। দশবিধ সংস্কার হইতে সমস্ত যাগ যজ্ঞ তাঁহাদের আয়ত্তে ছিল। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও পাপ ক্ষালিত হইত না। ব্রাহ্মণ না আসিলে কোনও গৃহস্থ কোনও ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। দৈনন্দিন কার্য্যও ব্রাহ্মণের সাহায্য-সাপেক্ষ ছিল। কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য আহার করিতে হইবে, কোন্ পরিচ্ছদ কি ভাবে পরিধান করা যাইবে, কোন্ বায়ু নিঃশ্বাসে লইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই জানিতেন না। ইহার পর কোন্ যজ্ঞে কোন্ দেবতার আবাহন করা উচিত, কোন্ দেবতাকে কি কি দ্রব্য উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কেবল ব্রাহ্মণেরাই বলিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, যদি পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে একটু দোষ হয়, পবিত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে একটু অসাবধানতা দেখা যায়, পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যের ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে গৃহীর সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সুতরাং হিন্দুরা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতি কোন সময়ে পুরোহিতের এরূপ বশীভূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের এরূপ অনুগত হইলেও হিন্দুরা মানসিক শক্তিতে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, মার্জ্জিত-বুদ্ধি, ও চিন্তাশীল ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় ক্রমে উন্নত ও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের জটিলতা, যজ্ঞ-স্থলে পশু-হত্যাসময়ে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা, ইহার উপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তি তিরোহিত হইল;

ক্রমে তাঁহারা কোন নূতন প্রণালীর জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

মহামতি গৌতম যখন আপনার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন হিন্দুদিগের হৃদয় এইরূপ তরঙ্গায়িত ছিল। এই অশান্তির সময়ে শাক্যসিংহকে হিংসা ও বৈষম্যের মূলোচ্ছেদে কৃতহস্ত দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব সকল লুক্কায়িত অবস্থায় রাখিতেন। ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকটে গোপনীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহাতে বিজাতি ও বিদেশী ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। বুদ্ধ যখন এই সঙ্কুচিত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "সকলে সমান" বলিয়া, সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, স্বজাতি বিজাতি, স্বদেশী বিদেশী, সকলের নিকটে যখন আপনার মত প্রকাশ করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ যখন সকল স্থানে সকলের নিকটে, তদীয় মতের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে লাগিল, গ্রামে, নগরে, রাজার প্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যখন "সকলে সমান," "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহাধ্বনি সমুত্থিত হইল, তখন অনেকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই সাম্যের মহিমাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক স্থানে প্রসারিত হইল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ফল।

ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যসিংহই সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই সমস্ত বৈষম্যের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন নাই। সকলের প্রতি এইরূপ ভ্রাতৃভাব প্রদর্শিত হওয়াতে সকলের

মধ্যে সমবেদনার সঞ্চার হয়। বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একতা স্থাপন ও এইরূপ সমবেদনার উৎপাদন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি ফল। অধিকন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়, এবং দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; অশোক এই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-কর্ত্তা। অশোক অনেক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া অনেককে এক ভূমিতে আনয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি হয়। এতদিন দক্ষিণাপথ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করাতে ক্রমে উহা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় খণ্ড রাজ্য থাকা ভাল। কিন্তু সভ্যতা বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ রাজ্যে অনেক উপকার হয়। অশোকের সাম্রাজ্যের বল বৃদ্ধিতে উপকার হইয়াছিল, যেহেতু বাক্ত্রিয়ার গ্রীক অথবা অন্য কোন বিদেশী রাজা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিতে সাহসী হয় নাই।

যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহারা আপনাদের ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। ক্রমে অনার্য্যেরা আর্য্যদের সহিত সম্মিলিত ও আর্য্যদের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিবার জন্য আর্য্যদের ভাষা অনেক অংশে আয়ত্ত করে। এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্য ভাষায় সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে যখন অনার্য্যদের উন্নতি হয়, যখন

শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাদের ভাষাও উন্নত হইয়া উঠে। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিপুষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত যাগযজ্ঞে পশু-হত্যা ও সোম প্রভৃতি সুরার ব্যবহারও অল্প হইয়া আইসে।

এদিকে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা নানা উপায়ে আপনাদের ধর্ম্ম সঞ্জীবিত করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতিতে হিন্দু ধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। শ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও স্থানে স্থানে সম্পূজিত ও সম্মানিত হইতেছিলেন। অহিংসার পার্শ্বে হিংসার, সাম্যের পার্শ্বে বৈষম্যেরও প্রভাব দেখা যাইতেছিল। খ্রীষ্টের ২৪৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীঃ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল, উভয় ধর্ম্মের এইরূপ প্রাধান্য ছিল। পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতে থাকে। মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি-স্রোত যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এত দিন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণের বিদ্যাবুদ্ধির মহিমায় ও ক্ষত্রিয়ের অর্থের ক্ষমতায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উন্নত হইতে থাকে। বৌদ্ধের চৈত্য, বৌদ্ধের মঠ ভারতবর্ষ প্রায় ছাইয়া ফেলিয়াছিল; ইহার পর বৌদ্ধের অট্টালিকা স্থানে স্থানে শোভা

হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য।

বিকাশ পূর্ব্বক সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল। লোকে বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে রামসীতা, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তির পূজায় হিন্দুদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল। এদিকে হিন্দুরা কোমল ভাষায়, কোমল কণ্ঠে আপনাদের ধর্ম্ম বীর ও যুদ্ধ-বীরগণের চরিত্র নানা স্থানে গাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোকে এই মধুর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিল। ইহার উপর হিন্দু যোগীরা স্বার্থ ত্যাগে ও কঠোর ব্রতাচরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিলেন। এই যোগীগণ প্রখর রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, অনাবৃত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া একান্ত মনে যোগাভ্যাস করিতেন। গ্রীকেরা ইঁহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ধর্ম্মের জন্য ইঁহাদের এইরূপ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, দলে দলে হিন্দুদের পদানত হইতে লাগিল। হিন্দুদের আর একটি সুবিধা ছিল। হিন্দুসমাজে থাকিয়া সকলেই আপনাদের রুচি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত। কেহ দেবতার পূজা করিত, কেহ একেশ্বরের উপাসনা করিত। কেহ ব্রাহ্মণের ও স্বশ্রেণীর অন্ন ভিন্ন আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিত না, কেহ বা ইচ্ছানুসারে সকলের অন্নই গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এ সুবিধা বৌদ্ধ ধর্ম্মে ছিল না। বৌদ্ধদের সকলকেই ঈশ্বর না মানিয়া

সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত। অবশেষে বৌদ্ধেরা নানাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহারা শেষে সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জনে সমর্থ না হওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা যথোচিত সাহস সংগ্রহ করিয়া, কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই বিমুখ হইলেন না। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাদের ক্ষমতা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, সহস্র সহস্র লোকে অবনত মস্তকে তাঁহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। খ্রীঃ ১,০০০ অব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইল। হিন্দুর আবাস-ভূমিতে হিন্দুধর্ম্ম আবার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

পৌত্তলিকতা ও কথকতার আবির্ভাব।

উপরে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রাধান্যের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন হিন্দু-সমাজে দুইটি বিষয়ের উৎপত্তি হয়, একটি পৌত্তলিকতা, অপরটি কথকতা। বৌদ্ধগণ যখন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, হিন্দুগণ তখন বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির মূর্ত্তির আরাধনা করিতে থাকেন। এইরূপে পৌত্তলিকতার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধগণ যেমন নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন, হিন্দুগণও তেমনি নানা স্থানে আপনাদের ধর্ম্ম-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতেই নানাবিধ পুরাণের সৃষ্টি হয়।

হিউএন্ থ্‌সাঙ্।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে তদ্দেশীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থল। কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। সুতরাং পবিত্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহমানসে চীন-দেশীয় বৌদ্ধ-গণ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষ-লতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষার-মণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বত, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়-সম্পন্ন চীন-দেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পথের এই দুর্গ-মতা তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক ব্যক্তি স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ গোবি মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, কেহ কেহ অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্ খৃীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকটে আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খৃীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফা-হিয়ান। ফা-হিয়ান খৃীঃ ৩৯৯ অব্দ হইতে খৃীঃ ৪১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

সংক্ষিপ্ত। ফা-হিয়ানের পর হোইসেঙ্ ও সঙ-যুনের ভ্রমণ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ খ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাট্-পত্নী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে আর এক জন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শনে এবং নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গবেষণা ও দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য বিঘ্ন-বিপত্তিপূর্ণ সময়ে রাজার অজ্ঞাতসারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন, এবং শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচলিত-হৃদয় ধর্ম্ম-বীরের নাম হিউএন্ থ্সাঙ।

হিউএন্ থ্সাঙের জীবনী।

হিউএন্ থ্সাঙ চীন দেশের কোন একটি উপবিভাগের নগরে খ্রীঃ ৬০৩ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাহউক, হিউএন্ থ্সাঙের পিতা কোন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষে কাজ ছাড়িয়া আপনার সন্তান-চতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই চারি সন্তানের

মধ্যে দুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সার-গ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরের নাম হিউএন্ থ্সাঙ।

হিউএন্ থ্সাঙ প্রথমে একটি বৌদ্ধ মঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, হিউএন্ থ্সাঙ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।

পরবর্ত্তী সাত বৎসর হিউএন্ থ্সাঙ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ থাকাতে তাঁহার নির্জ্জন-পাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তিনি বহুদূরতর স্থানের নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে—বিদ্রোহের এইরূপ বিঘ্ন বিপত্তি-পূর্ণ সময়েও হিউএন্ থ্সাঙ্ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। শাস্ত্রালোচনা তাঁহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্সাঙ্ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে আরূঢ় হন। এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ, এবং স্বদেশের দর্শনশাস্ত্র, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্গণের পাদতলে

বসিয়া ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হই-লেন। বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সাঙ তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোথাও প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনু-বাদিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না; বরং অনুবাদে তাঁহার সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য ভারত-বর্ষে যাইতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। ফা-হিয়ান প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সাঙ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও এই সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে যাইয়া মূল ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চীন সাম্রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউএন্ থ্সাঙ ও আর কয়েক জন পুরোহিত পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সম্রাটের নিকটে আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউএন্ থ্সাঙের সতীর্থগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সাঙ ভারতবর্ষে যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রীঃ ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্সাঙ

এইরূপ অবিচলিত হৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভারত-বর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষ-যাত্রীগণ সমবেত হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা সকলকে সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সাঙ আপনার সমধর্ম্মাদিগের সাহায্যে শান্তি-রক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাঁহার অন্বেষণে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই তরুণ-বয়স্ক বৌদ্ধ যতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, তাঁহারা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এপর্য্যন্ত দুই জন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এইখানে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ পরিচালক-বিহীন ও বন্ধু-বিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাঁহার পথ-প্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউএন্ থ্সাঙ ইহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথ-প্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও পাঁচটি গুম্বজ অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি গুম্বজে রক্ষীগণ দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদ-চিহ্ন বা কঙ্কাল ব্যতীত পথ-জ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউএন্ থ্সাঙ বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও ধীরভাবে প্রথম গুম্বজের নিকটে উপনীত হইলেন। এইখানে রক্ষীবর্গের

নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে পারিত। কিন্তু এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই সাহসী তীর্থযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্যান্য গুম্বজে যাইতে ইঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ গুম্বজ সকল অতিক্রম করিয়া, আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। যে চর্ম্ম-ভাণ্ডে করিয়া তিনি জল আনিতেছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া গেল। হিউএন্ থ্সাঙ পথহারা হইয়া সেই ভীষণ মরুভূমিতে জলের অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্য-বসায় এতক্ষণে বিচলিত-প্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ যেন কোন অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার সাহস ও অধ্য-বসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিউএন্ থ্সাঙ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ প্রতি-নিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায় তাহাও ভাল, তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্ব দিকে ফিরিব না।" হিউএন্ থ্সাঙ আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন, এক বিন্দু জল পান না করিয়া চারি দিন পাঁচ রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়া হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের

বলে বলীয়ান্ হইয়া,একটি বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাতারদিগের অধিকৃত। তাতারেরা হিউএন্ থ্সাঙকে আদর সহকারে গ্রহণ করিল। এক জন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউএন্ থ্সাঙকে আপনার লোকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ্ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার ভূপতি শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সাঙের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউএন্ থ্সাঙ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার মন এবং আমার ইচ্ছার উপর তিনি কোনও ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না।" এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, হিউএন্ থ্সাঙ তাতার রাজ্যে আপনার দেহ পাত করিবার জন্য পান আহার হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ এক মাস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এক মাস কাল ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্র-স্বভাব অতিথির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতার-রাজের আদেশে বহুসংখ্য অনুচর হিউএন্ থ্সাঙের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার দিয়া, এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতার ভূপতি তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ্ এই অনুচরগণের সহিত অনেকগুলি তুষার-মণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বাক্ট্রিয়া ও কাবুলিস্তান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন।

এই সকল তুষার-সমাচ্ছাদিত পর্ব্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিতে সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউএন্ থ্সাঙ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। এই ভূখণ্ড আদিম আর্য্য জাতির আদি নিবাস-ভূমি। প্রাচীন আর্য্যগণ এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। খৃীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল অধীত হইত। কৃষি-কার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসীরা রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা গান-বাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীশের রাজধানী এথেন্স্ যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া, সমস্ত ইউরোপে সম্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ নগরেরও তেমনি প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা সমর-খন্দ-বাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়-প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এখানে বর্ণিত হইল। হিউএন্ থ্সাঙ্ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়া-ছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূর-দর্শিতার গম্ভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তাঁহার ভ্রমণ-

বৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউএন্ থ্‌সাঙ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে(পেশাবর) উপনীত হন,এবং এই স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম পূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হন। এত দিনে এই অধ্যবসায়-সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ—কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী,বারাণসী,বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন,দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন; একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পড়িয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়-সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, একটি অসহায়, বিদেশী দরিদ্র যুবক আপনার সাহস ও উদ্যম, এবং আপনার অসাধারণ ধর্ম্ম-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউএন্ থ্‌সাঙ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্জিবিরম্) আসিয়া শুনিলেন, সিংহল দ্বীপ আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না, কাঞ্চীপুর হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া, কিয়দ্দূরে আসিয়া দক্ষিণাপথ অতিক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে

আসিলেন, এবং সেখান হইতে সিন্ধুনদ দিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চ-লের প্রধান প্রধান নগর দর্শন পূর্ব্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউএন্ থ্সাঙ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছু দিন একত্র বাস করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। ইহার পর এই পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলিস্তান দিয়া মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে আসিলেন, এবং তুর্কিস্তান হইতে পূর্ব্ব তাতারের কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছু কাল থাকিয়া, ষোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন, ও বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খৃীঃ ৬৪৫ অব্দে আপনার গরীয়সী জন্ম-ভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণ-কার্য্য সমাপ্ত হইল, এই-রূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরব-শ্রীতে সমুন্নত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখন চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-শালী দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ক্রেটি করিলেন না। এক সময়ে চরগণ যাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শান্তি-রক্ষকগণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখি-বার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি এখন প্রভূত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশ-সময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্প সকল শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়-পতাকা সকল বায়ু-ভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষেরা পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা

আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গেলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্সাঙ বুদ্ধের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি, এবং ৫২০ খণ্ডে পরিসমাপ্ত ৬৫৭ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট ইহাতে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্সাঙ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায় আপনার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সহিত একত্র হইয়া, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, হিউএন্ থ্সাঙ বহুসংখ্য সতীর্থের সাহায্যে ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদ-সময়ে তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থ-পরিগ্রহের জন্য নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে

করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ সময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউএন্ থ্সাঙ চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তেমনি প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্ম-চিন্তা, গ্রন্থ-প্রণয়ন ও গ্রন্থ-প্রচার করিয়া, হিউএন্ থ্সাঙ ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যু-সময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিয়া, তাঁহাদের নিকটে বিদায় লইলেন। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্য প্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউএন্ থ্সাঙের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড শোণিত-রঞ্জিত করিতেছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণির অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হিউএন্ থ্সাঙের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ চরিত্র পরিস্ফুট হওয়া একান্ত অসম্ভব। ধর্ম্ম-বীর কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত উৎসাহের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য অতি সংক্ষেপে তদীয় জীবনী লিখিত হইল। সংসারের সমস্ত প্রলো-ভন পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কিরূপ ধীরতার সহিত ভয়ঙ্কর

মরুভূমি অতিবাহন করিয়াছিলেন, কিরূপ দৃঢ়তার সহিত তাতার ভূপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিরূপ স্থিরতার সহিত ভারতবর্ষের বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের নির্জ্জন গৃহে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্বদেশে যাইয়া, কিরূপ নম্রতার সহিত সম্রাটের সমক্ষে প্রধান রাজকীয় পদ গ্রহণে অনিচ্ছা দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে জানিতে পারা যায়। দূরদর্শিতায় ও অভিজ্ঞতায় তিনি তদানীন্তন সময়ে এক জন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিৎ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। কোন কোন অংশে তাঁহার দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি সাতিশয় কৌতূহলপর ছিলেন। কুসংস্কার প্রযুক্ত অনেক অলৌকিক বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিত। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ এই দুর্ব্বলতাকে একবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চরিত্রে স্বার্থপরতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের জন্য তিনি সমস্ত পার্থিব সুখে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া অম্লানভাবে নানাবিধ কষ্ট সহিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মত্যাগ ও এইরূপ আত্মসংযমের বলে তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়। ইহার পর তাঁহার সাধুতা তাঁহাকে সাধারণের বরণীয় করিয়া তুলে। তিনি কখনও কোনরূপ অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই, এবং কখনও পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনার হৃদয় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি আচার ব্যবহার ও শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ বিদেশী হইলেও সকলের সমবেদনা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও বীরপুরুষেরা যেমন স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, গ্রীশের যুদ্ধ-বীরেরা যেমন স্বাধীনতার জন্য

সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, পৃথিবীর কেন্দ্র-আবিষ্কারকেরা যেমন বিজ্ঞানের জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই দরিদ্র ধর্ম্ম-বীরও তেমনি ধর্ম্মের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। হিউএন্ থ্সাঙ এই সকল মহাপুরুষের সহিত এক শ্রেণীতে স্থান পাইবার অধিকারী, এবং হিউএন্ থ্সাঙ এই সকল মহাপুরুষের ন্যায় সাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য।

হিউএন্ থ্সাঙের সময়ে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা।

হিউএন্ থ্সাঙের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দু-দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধ মঠ আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ,উভয়েই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দু আর্য্যেরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সুখের আবাস বলিয়া মানিতেন, বৌদ্ধেরা ইহাকে জল-বিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বলিতেন। মৃত্যুর পর হিন্দু আর্য্যগণ অনন্ত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও অনন্ত সুখময় স্বর্গরাজ্যের আশা করিতেন, দেহত্যাগের পর কর্ম্মফলে পুনর্ব্বার দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া, বৌদ্ধগণ স্থিরচিত্ত থাকিতেন। বৈদিক নিয়মের উপর হিন্দু আর্য্যদের অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারা বেদানুমোদিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অভীষ্ট পার্থিব বস্তু ও অন্তিমে অনন্ত স্বর্গীয় সুখ অভিলাষ করিতেন, বৌদ্ধগণ বেদ ও বৈদিক কার্য্য-প্রণালীর বিদ্বেষী ছিলেন। সদাশয়, সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও তত্ত্ববিদ্যায় অনুপ্রাণিত হইলে হিন্দু আর্য্য ব্রহ্মপরায়ণ আচার্য্যের শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়া সাধারণের নিকটে সম্মান পাইতেন,সমস্ত পার্থিব সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

নির্জ্জনে ধর্ম্মচিন্তায় অভ্যস্ত হইলে বৌদ্ধ "শ্রমণ" নামে বিশেষিত হইতেন। হিন্দু আর্য্যেরা দেবতাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের উপাসনা করিতেন, বৌদ্ধেরা দেবতা-পূজা হইতে বিরত হইয়া, বুদ্ধের নিয়ম অনুসারে চলিতেন। হিন্দু আর্য্যেরা বৈষম্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা উচ্চতর বর্ণকে উচ্চতর কর্ত্তব্য সম্পাদনের অধিকার দিতেন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ—ব্রাহ্মণের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পরিধেয় দিয়া সন্তুপ্ত করিতেন, বৌদ্ধগণ সাম্যের মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়া, সর্ব্ব জীবের প্রতি সমবেদনা দেখাইতেন। তাঁহাদের দয়া ও অনুগ্রহ সার্ব্বজনীন ছিল। হিন্দু আর্য্যগণ যজ্ঞ ও আপনাদের আহারের জন্য জীবহত্যা করিতেন, বৌদ্ধগণ জীবহত্যা হইতে বিরত থাকিয়া, অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিতেন। হিন্দু আর্য্যের ঈশ্বর-বাদী হইয়া ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে চলিতেন, বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর-বাদী হইয়া আপনাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতেন। হিউএন্ থ্সাঙ্ যখন ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন এই বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন।

হিউএন্ থ্সাঙ্ যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, সে পথের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা উন্নত ছিল। কপিশা রাজ্যে (বর্ত্তমান কাবুলিস্তান) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এইখানে এক শতটি মঠে ছয় হাজার শ্রমণ থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। সন্ন্যাসীগণ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত, কেহ সমস্ত দেহে ভস্ম মাখিত,

কেহ বা কপাল-সমূহ অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিত। পেশাবর এই কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল। এই স্থানে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের নির্ম্মিত বহুসংখ্য ভগ্ন মঠ কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্মীরের রাজা হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। থানেশ্বর ও মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। হিউএন্ থ্‌সাঙ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষত্রবীরগণের বৃহদাকার কঙ্কাল-সমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জ রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বৈশ্যবংশীয় হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার জয়-পতাকায় শোভিত করেন। ভারতবর্ষের আঠার জন রাজা তাঁহার করদ হন। মহারাষ্ট্র-রাজ পুলকেশ ব্যতীত সাহসে ও পরাক্রমে ভারতবর্ষে শিলাদিত্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অযোধ্যায় হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রয়াগে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতেছিল। হিউএন্ থ্‌সাঙ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দুঃখিত হন। বুদ্ধ, বারাণসী প্রভৃতি যে কয়েকটি নগরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্নদশাপন্ন ও উহার মঠ সকল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মগধের পঞ্চাশটি মঠে দশ সহস্র শ্রমণ বাস

করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। যে প্রাচীন পাটলীপুত্র এক সময়ে সুরাজকতা ও সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যকে অধঃকৃত করিয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে তাহার পূর্ব্ব-গৌরব, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহার বহুসংখ্য অট্টালিকা ও বহুসংখ্য মঠের ভগ্নাবশেষ প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। হিউএন্ থসাঙ যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নালন্দায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্র-কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ এই আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ নৃপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যালয় এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এইখানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় শিক্ষার্থীগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য এক শতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্য স্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর

সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল এই স্থানের শান্তি ভঙ্গ করিত না, সাংসারিক প্রলোভন ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থীগণ এই পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্র-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্য-সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও ইহা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং ইহার শিক্ষার্থী-গণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্র-চিন্তায় ভারতবর্ষে প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা-মন্দিরের প্রধান অধ্যা-পকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্র-জ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্ম-পরতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায়, এবং অসাধারণ দূরদর্শিতায় এই বর্ষী-য়ান্ পুরুষ নালন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিউএন্ থ্‌সাঙ ভারতীর এই লীলা-ভূমিতে যাইতে নিম-ন্ত্রিত হন। তিনি অভিজ্ঞতা-সংগ্রহ মানসে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদিত ছিল না। নালন্দার শ্রমণগণ এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিউএন্ থ্‌সাঙকে আদরসহকারে আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া হিউএন্ থ্‌সাঙের নিকটে উপস্থিত হই-লেন। হিউএন্ থ্‌সাঙ বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহা-

দের সহিত নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ সময়ে দুই শত জ্ঞান-বৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্য বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ সুগন্ধি পুষ্প সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসা-গীতি গাইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্-থ্সাঙ প্রথমে বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন; হিউএন্ থ্সাঙ বেদীর সম্মুখে আসিয়া বিনয়-নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্ থ্সাঙ শীলভদ্রের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত হন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়, দশ জন লোক তাঁহার অনুচর হন, দুই জন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন, মহারাজ শিলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। হিউএন্ থ্সাঙ এইরূপে সকলের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন, পাঁচ বৎসর মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই, কালের কঠোর আক্রমণে নালন্দা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

হিউএন্ থ্সাঙ নালন্দা হইতে বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্য-ভারতবর্ষে গমন করেন। এই সকল জনপদের কোথাও বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের প্রাধান্য,কোথাও বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপতি ব্রাহ্মণ। ইনি 'কুমার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুমার, মহারাজ শিলাদিত্যের করদ ছিলেন। তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) একটি প্রধান বন্দর ছিল। হিউএন্ থ্ সাঙ এই স্থানে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুতদিগের ন্যায় দীর্ঘকায়, সরল-স্বভাব, সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। কোপন-স্বভাব হইলেও তাহারা কৃতজ্ঞতা হইতে বিচ্যুত হইত না। তাহারা মিত্রের সাহায্য করিতে,এবং শত্রুর অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহাদের এতদূর আত্ম-সম্মান বোধ ছিল যে, শত্রুকে পূর্ব্বে না জানাইয়া, তাহার অপকারে অগ্রসর হইত না। তাহারা পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু শরণাগতের উপকার করিত। তাহাদের সেনাপতিরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে নারীজাতির পরিচ্ছদ পরিত, এবং প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া, আত্মাবমাননার শান্তি করিত। তাহারা যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মদিরা-পানে উন্মত্ত হইত, এবং আপনাদের হস্তীগুলিকেও এইরূপে প্রমত্ত করিয়া তুলিত। যুদ্ধোন্মত্ত থাকিলেও মরহট্টারা শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী ছিল না। তাহারা যথানিয়মে বিদ্যাভ্যাস করিত। মরহট্টাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়-রাজ পুলকেশ এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইনি যেমন উদার-স্বভাব, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁর দানশক্তির অবধি ছিল না। প্রজারঞ্জকতা-গুণে ইনি সাধারণের বড় প্রিয় ছিলেন। প্রজারা কায়মনোবাক্যে ইহাঁর আদেশ পালন

করিত। মহারাজ শিলাদিত্য অনেক স্থান আপনার বিজয়-পতাকায় শোভিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্র-রাজ পুলকেশকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

হিউএন্ থ্সাঙ্ ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা প্রবঞ্চনা বা কোন বিষয় জাল করিত না। তাহারা শপথ দ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়-তর করিত, এবং কোনরূপ পাপ করিলে পরলোকে কঠোর শাস্তি ভোগের আশঙ্কায় ভীত থাকিত। তাহাদের আচার ব্যবহার সরল ও ভদ্র, এবং তাহাদের স্বভাব শান্ত ও নম্র ছিল। হিন্দু-দের বিচার-কার্য্য সাতিশয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। কঠোরতম শাস্তি ছিল না। বিদ্রোহীদিগের প্রতিও মৃত্যু-দণ্ডাদেশ হইত না। রাজদ্রোহীগণ কেবল যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ থাকিত। বেত্রা-ঘাতের নিয়ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ন্যায়ের অন্যথাচরণ করিত, বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে ঔদাসীন্য দেখাইত, তাহাদের হস্তপদ বা নাসাকর্ণ ছেদন করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে দণ্ড বিধান করা হইত না। দোষ স্বীকার করাই-বার জন্য বেত্রাঘাতের নিয়ম ছিল না। যদি অপরাধী সর-লভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া আপনার দোষ গোপন করিত, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহার দোষাদোষ নির্দ্ধারিত হইত।

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউএন্ থ্সাঙও ভারতবর্ষে অনেক-

গুলি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। এক আর্য্যাবর্ত্তেই এইরূপ ৭০টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রতি রাজ্যের রাজারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতীয় লোকের আবাস-ভূমি। এই সকল লোকের ভাষা ও আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। ইহার উপর সমুন্নত পর্ব্বত, বেগবতী তরঙ্গিণী, সুবিস্তৃত অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অন্তরায়ে জনপদগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সকল কারণে প্রাচীন সময়ে অনেক খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খণ্ড রাজ্যের কোন ভূপতি যদি পুরু বা চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা শিলাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ অধিকার পূর্ব্বক সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে অধিরোহণ করিতেন।

উদার-স্বভাব বৌদ্ধ ভূপতিদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লোকে কোন প্রকার গুরুতর কর-ভারে নিপীড়িত হইত না। কেহ কাহাকে অমনি খাটাইয়া লইত না। যাহারা অট্টালিকানির্ম্মাণে বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমের হার অনুসারে বেতন পাইত। জনসাধারণ আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্বে কখন বঞ্চিত হইত না। তাহারা আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য কৃষি-কার্য্য করিত। কৃষকগণ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া আর সমুদয় আপনারা রাখিত। বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে কুৎ ঘাটে সামান্য রকম কর দিতে হইত। সৈনিকেরা কেহ কেহ রাজ্যের সীমান্ত ভাগ, কেহ কেহ রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিত। প্রয়োজন অনুসারে সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত

হইত। পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া, সাধারণকে সৈনিক শ্রেণীতে নিবেশিত করা যাইত।

রাজকীয় ভূমি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত, তাহার চারি ভাগ হইত। এক ভাগ রাজ্য ও ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ থাকিত, দ্বিতীয় ভাগ মন্ত্রী ও শাসন-সমিতির কর্ম্মচারীগণের ভরণ পোষণের জন্য দেওয়া যাইত, তৃতীয় ভাগ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রতিভা-শালীদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য রাখা হইত, এবং চতুর্থ ভাগ "সন্তোষ-ক্ষেত্রের" ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমা থাকিত। সকল শাসন-কর্ত্তা, শান্তিরক্ষক ও রাজকীয় কর্ম্মচারী, আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইতেন।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর "সন্তোষ-ক্ষেত্রের" উৎসব ভারতের ইতিহাসের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। এই সময়ে মহারাজ শিলাদিত্য এই মহোৎসব সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে পাঁচ বার এই উৎসব-কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল। হিউএন্ থ্সাঙ যখন নালন্দায় ছিলেন, তখন ষষ্ঠ বার এই অনুষ্ঠান হয়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে

সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এই সমস্ত গৃহের এক একটিতে একবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধু-শূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য, আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু ও আসাম-রাজ কুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহার চারি দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতু ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্য ভাগে সৈন্য-স্থাপন করিতেন। আর কুমার যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিক-দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অব-

মাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হ'ত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজন-শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদিত্য যোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পবিত্র

প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্রস্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারতবর্ষের প্রাচীন নৃপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপতিগণ ধর্ম্ম-সঞ্চয়-মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ; উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত, উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এ জন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল-কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এ দিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। এতদ্ব্যতীত যে

সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাবপ্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। এই সকল কারণে রাজ্যের বল বৃদ্ধি হইত। সুতরাং এগুলি সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাজনৈতিক ফলের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ যে, সচেষ্ট ও স্বকর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তাঁহারা সকল বিষয়েই আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠেন, ক্রমে তাঁহারা অভিনব বিষয়ে উদ্ভাবনা দেখাইয়া, সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকেন। উপনিষদে যে সকল গভীর তত্ত্বের বিবরণ আছে, বোধ হয় তাহাই সমস্ত জগতের আদিম দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু ঐগুলি সে সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। মহাভারতের সময়ে দর্শন শাস্ত্রের আবার জীবনী-শক্তি লক্ষিত হইলেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। মহামতি শাক্যসিংহ যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন, সকল স্থানে যখন সাম্য ও অহিংসার আদর লক্ষিত হইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় বুদ্ধকে অধঃকৃত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। হিন্দুদের এইরূপ মানসিক উন্নতিতে দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে উন্নতাবস্থ ষড়দর্শনের প্রচার হয়। স্মৃতি, আর্য্যদের আচার-ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থ। বৈদিক সময়ে ইহ

ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতি।

পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে ইহা সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়। এইরূপে ধর্ম্ম-বিপ্লব-সময়ে প্রায় সকল দিকেই হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমাদের গৌরবের একটি প্রধান সময় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও সাধারণের উন্নতি ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন দেখা যাইতে থাকে। জ্ঞান-ভাণ্ডারের এক দিকে প্রতিভা ও গবেষণার আলোক বিকাশ পাইলে ক্রমে অন্যান্য দিকও উহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং লোক-সমাজের এক দিকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই স্রোত সমস্ত সমাজে ব্যাপিয়া পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ঠিক এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধ যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তাহাতে ভারতের লোক-সমাজ এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল সজীব ও সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে সমাজের সকল বিভাগেই অবচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার দেখা যাইতেছিল, সকল বিভাগই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তেজের মহিমায় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুরা বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন, আরব ও মিশরের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপনাদিগকে পৃথিবীর বরণীয় করিয়া তুলেন। ইঁহাদের দূতগণ রোমের সম্রাটের নিকটে আদরসহকারে পরিগৃহীত হন, ইঁহাদের কার্পাস বস্ত্র, মসলিন, রেসমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি আরব ও মিশরের বণিকগণ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ করিতে থাকেন, এবং

ইহাঁদের শাসন-প্রণালীর শৃঙ্খলা ও নগরের পারিপাট্য দেখিয়া বিদেশী ভ্রমণকারীরা ইহাঁদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। এ দিকে আর্য্যেরা সারস্বতী শক্তির উপাসনাতেও বিশেষ যত্নশীল হন। তাঁহারা জ্ঞানের মহিমায় ক্রমে সভ্য জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রারম্ভ হইতে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়গণ শাস্ত্রালোচনায় আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদির শুভ ক্ষণ নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে জ্যামিতি ও গণিত বিদ্যারও যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছিল, এবং স্বর-সংযোগে বেদগান-সময়ে মন্ত্রের উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গে ব্যাকরণেরও কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে জ্যোতিষ ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহমিহির এই সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আর্য্যভট্ট এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ বিধানে যত্নশীল হন। ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় দুহিতা লীলাবতী গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চরক ও সুশ্রুত দ্বারা চিকিৎসাবিদ্যার ভূয়সী উন্নতি হয়। কালিদাস রঘুবংশ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সকলের বরণীয় হন। অমরসিংহ অভিধান সঙ্কলন পূর্ব্বক সাহিত্য আলোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। এই রূপে ভারতবর্ষের এই গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েরই ক্রমোৎকর্ষ হইতে থাকে। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত

হয়। এই সময়ে ইঙ্‌লণ্ড ও ফ্রান্স অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণির নিরক্ষর অসভ্যগণ আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল।

ধর্ম্মবিপ্লবের মন্দ ফল।

বিপ্লবের সকল ফল দেশের হিতকর হয় না। এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের সকল ফলও ভারতবর্ষের মঙ্গল-জনক হয় নাই। কোন কোন অংশে ইহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। চিন্তাশীল জ্ঞানী পুরুষেরা নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন, পরলোকে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও সুখপ্রদ, যাহা কিছু হৃদয়ের তৃপ্তিকর, তৎসমুদয়ই পরলোকে পাওয়া যাইবে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কেবল মায়া। মায়াময় সংসারে আসক্ত থাকা উচিত নহে। ইহা মনে করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানীরা ক্রমে সংসার-বিরক্ত হইয়া উঠেন। বৈরাগ্যের আধিক্যনিবন্ধন কেহ কেহ আত্ম-সংযম পূর্ব্বক যোগাসনে সমাসীন হইয়া, অবিচ্ছিন্নভাবে তপস্যায় নিবিষ্ট হন। এই রূপে হিন্দু আর্য্যেরা অন্তস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইলেন, কিন্তু বহিস্তত্ত্বে তাঁহাদের অধিকার জন্মিল না। তাঁহারা বহির্বিষয়ক জ্ঞানে বঞ্চিত হইলেন। যে জ্ঞানের বলে সংসারের উন্নতি হয়, লোক-সমাজের উপকার হয়, সংক্ষেপে যে জ্ঞানের মহিমায় আজ সুসভ্য ইউরোপীয়গণ সমস্ত পৃথিবীতে মহতী দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছেন, ভারতবর্ষে সে জ্ঞানের উন্নতি হইল না। হিন্দু আর্য্য-সভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল, মনোহর কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকাশ পাইল, কিন্তু একখানি প্রকৃত ইতিহাস, কি একখানি পদার্থ-বিদ্যার উৎপত্তি হইল না। হিন্দু আর্য্যগণ জগতে অদ্বিতীয় চিন্তাশীল বলিয়া

প্রসিদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের তত্ত্ববিদ্যা, তাঁহাদের বীজগণিতের প্রক্রিয়া, তাঁহাদের দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন-প্রণালী, জগতের লোকে আদর সহকারে গ্রহণ করিল, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মাত্মক উপদেশে সাধারণকে বলীয়ান্ করিতে পারিলেন না।

বিক্রমাদিত্য।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় স্থান-বিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও যখন প্রাধান্য ছিল, তখন মধ্য ভারতবর্ষে একটি হিন্দুরাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। উজ্জয়িনী এই রাজ্যের রাজধানী, এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রাজ্যের অধিপতি। বলা বাহুল্য, মহাকবি কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিদ্যার সমাদর করিয়া লোক-প্রসিদ্ধ হন। সাহসে ও পরাক্রমেও ইহাঁর খ্যাতি বাড়িয়া উঠে। ইনি শক জাতিকে পরাজিত করিয়া "শকারি" নামে অভিহিত হন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণ মতে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্থাপিত "সংবৎ" চলিয়া আসিতেছে।

কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।

ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম অধঃকৃত করিবার জন্য আপনাদের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দেন। এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তাড়িত বেগের প্রভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই আন্দোলন-সময়ে দুইটি মহাপুরুষ বৌদ্ধ ধর্ম্ম উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহাঁদের একটির নাম ভট্ট কুমারিল; অপরটি মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য। কুমারিল ভট্ট মৈথিল ব্রাহ্মণ। অনুমান খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে

ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শঙ্করাচার্য্য মলবারের ব্রাহ্মণ। খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত ইহাঁর অসাধারণ লিপি-পটুতা ছিল। ইনি বহুসংখ্য গ্রন্থ লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাঁর লেখনীর মহিমায় বেদান্ত-দর্শন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং ইহাঁর বিচার-ক্ষমতায় ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ কেদারনাথ তীর্থে শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যু হয়। শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বয়সের মধ্যে তিনি লোকাতীত তেজস্বিতা সহকারে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার মত স্থাপন করেন।

পঞ্চম পাঠ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত—ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ।

ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত।

খ্রীষ্টীয় শাকের প্রারম্ভ হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহার পর একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিধর্ম্মী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত বিপ্লাবিত করে। বহু পূর্ব্বে পারশীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই; দিগ্বিজয়ী সেকন্দর-শাহ বীর-শ্রেষ্ঠ পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য বিনাশ পায় নাই; বক্ত্রিয়ার গ্রীকগণ পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই; আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধু-ক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কাসেমের হত্যার পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত রহে নাই। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে যেরূপ দৌরাত্ম্য সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। সুলতান মহম্মদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ

অপহরণ ও অনেক লোক নষ্ট করেন। ভারতবর্ষের অতুল ধন-সম্পত্তি এইরূপে দেশান্তরে নীত হইয়া থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর শোভিত হয়, এবং সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি ও তদীয় মন্দিরের চন্দন কাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট গজনির মাহাত্ম্য বা দৌরাত্ম্য বিকাশ করে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা কেবল অর্থ বিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিল,ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন প্রদর্শন করে নাই, কিন্তু মহম্মদ গোরী মধ্য এশিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহমূদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। এই সময়ে মহারাজ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত একত্র হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের অসীম চাতুরীর প্রভাবে তাঁহাদের পরাজয় হইল, দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিয়া গেল। মহম্মদ গোরী বিজয়ী হইয়া আপনার প্রিয়পাত্র কোতোবদ্দিন ইবক্‌কে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া গেলেন। ভারতে মুসলমানের আধিপত্য কোতোবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইল।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ।

ভারতবর্ষ কেন মুসলমানের পদানত হইয়াছে? যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ কেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন? কেন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন? ইহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মাকিদনের অধিপতি সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হন। এশিয়ায় আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী জাতি। অল্প-কাল মধ্যে ইহাদের বিজয়পতাকা মিশর, পারশ্য, স্পেন, তুরস্ক ও কাবুলে উড্ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ এক শত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ-জয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিন্ধু দেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই আবার উহা স্বাধীন হইয়াছিল। যাঁহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারা পাঠান। পাঠানেরা আরবদিগের ন্যায় প্রতাপ-শালী বা সমৃদ্ধিপন্ন ছিলেন না, তথাপি ভারতবর্ষ তাঁহাদের হস্ত-গত হয়। পৃথ্বীরাজের পর আর কোন ভারতীয় বীর তাহা-দিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ দুর্জ্ঞেয় নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম-বিপ্লবে হিন্দুদের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কেবল মায়া। এ দিকে ভূমি উর্ব্বরা, দেশ শস্য-সম্পত্তি-পূর্ণ। সুতরাং জীবিকা-নির্ব্বাহে হিন্দুদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। এই রূপে শারীরিক পরিশ্রমে বিরত হওয়াতে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠেন। চিন্তাশীলতাপ্রযুক্ত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্য সুখে অনাস্থা জন্মে, এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। যে জাতি এরূপ নিশ্চেষ্ট, সে জাতি যে চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিবে, তাহা সম্ভবপর নয়। হিন্দুরা আপনাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া-

ছেন বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেশ হইতে শত্রুদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য চিরকাল দলবদ্ধ থাকেন নাই। তাঁহারা চিন্তার স্রোতে ভাসমান হইয়া, ক্রমে বাহ্য বিষয়ে অনাস্থাবান্ ও স্বাতন্ত্র্যে হতাদর হইতেছিলেন। তাঁহাদের উদাসীনতা ক্রমে বহু বিষয়ে ব্যাপিয়া পড়িতেছিল। রাজা স্বদেশী হউন, কি বিদেশী হউন, তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানের রাজত্ব-সময়ে কেবল এক মিবার ভিন্ন আর কোনও ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্র্য-গৌরব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিয়াছে? তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে যে, মিবারের রাজপুতগণই পৃথিবীর মধ্যে সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া, আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল মস্তক অবনত রাখে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়াও বিজেতার পদানত হয় নাই, এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনার জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা

বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরো-হিতগণের প্রাধান্য, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূ-সম্পত্তি হইতে স্খলিত হই-য়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পর-হস্তগত হইয়াছে, অনেক সৈন্য পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া-ছেন, স্বাধীনতা রক্ষায় তাচ্ছীল্য দেখান নাই; মিবারের বীর-রমণী রণ-স্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই; মিবারের বীর বালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই। ব্রিটিশভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতি-হাস আর কোন স্থানে এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে না। ভারতের হিন্দুগণ ক্রমে এ বিষয়ে আপনাদের উদাসী-নতারই পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার ন্যায় হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্র-দায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্য্যবন্ত আর্য্য-পুরুষেরা যখন মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায় নাই।

তাঁহারা তখন একতা-সম্পন্ন ছিলেন, এবং একপ্রাণ হইয়া চারি দিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। ইহার পর ক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়,ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক-ভাব বিকাশ পাইতে থাকে।

জাতীয়ভাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ,সমান জাতি ও সমান ভাষা। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতি বা ভাষা এক নহে। সমগ্র এশিয়ার লোক এক জাতি, ইহারা এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, ইহা বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর সমগ্র ভারতের লোক এক জাতি, ইহারা এক ভাষায় আলাপ করে, ইহা বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে বুঝিতে পারে না, এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়া পড়ে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদ-বাসীর চিন্তা, ধারণা, সমবেদনা প্রভৃতি পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবনা নাই। একবিধ ধর্ম্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচার ব্যবহার প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের অদৃষ্টে ইহাও ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক অন্তরায়েও কোন সময়ে সমগ্র ভারতের সংযোগ সাধিত হয় নাই, কোন সময়ে সমগ্র ভারতে

জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যায় নাই। এইরূপ অপরিসীম প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গ সকল বহুকাল হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না, এক অঙ্গে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে, আর এক অঙ্গের স্পন্দন-ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে—এই অনৈক্যে ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশালী হয় নাই।

উল্লিখিত কারণে বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত রহিয়াছে। প্রতিমণ্ডল ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ব্যবহার-পদ্ধতির, ভিন্ন ভাষার লোকের আবাস-স্থান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একতা নাই। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারেন নাই, কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের গৌরব দেখা যায় নাই। যখন সাহাবদ্দীন গোরীকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ দৃষদ্বতীর তীরে সমাগত হন, তখন কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন নাই। এই বিচ্ছেদ ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চির-প্রসিদ্ধ হিন্দু জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। আবার মুসলমানেরা যখন সিন্ধু নদ পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভারতবর্ষে ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অনুগত বা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনৈক্যের উদাহরণ বিরল নহে। যখন মিবারে প্রতাপসিংহ

গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত, তখন রাজানুগত রাজপুত সেনানী মানসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; আবার দক্ষিণাপথে শিবজী যখন জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে দুর্জ্জেয়, তখন মোগল সম্রাটের সেনাপতি জয়সিংহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত। এই অনৈক্যের অভাব ও জাতি-প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয় ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে কেবল দুই বার দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণাপথে শিবজী এক বার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাদের ক্ষমতায় অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, এবং চিরজয়ী মুসলমান চিরপরাধীন হিন্দুর পদানত হইয়া পড়ে। আর এক বার গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে পঞ্জাবে একটি মহাজাতির অভ্যুদয় হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহের ক্ষমতায় এই মহাজাতি এই শেষ বার সিন্ধু নদ পার হইয়া হিন্দু-বিজয়ী পাঠানদিগের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা উড়াইয়া দেয়। এই দুই মহাবীরের অনন্ত কীর্ত্তির কাহিনী ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। যদি পাঠানের অভ্যুদয়-সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ জাতি-প্রতিষ্ঠা বা জাতি-হিতৈষিতার আবির্ভাব দেখা যাইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বোধ হয় রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press—Calcutta.